# সরল বিজ্ঞান-শিক্ষা

তৃতীয় ভাগ

# সরল বিজ্ঞান-শিক্ষা

## তৃতীয় ভাগ

( সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য )



কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের জীব-বিজ্ঞানের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও
বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের মাইক্রো-বাইওলজি বিভাগের অধ্যক্ষ
**ডাঃ প্রমথনাথ নন্দী**, এম. এস-সি., পি-এইচ. ডি. ( লণ্ডন )



অশোক পুস্তকালয়
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন, ১৩৬১



মূল্য এক টাকা আট আনা মাত্র

৬৪, হারিসন রোড, কলিকাতা-৯, অশোক পুস্তকালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীভারতী দেবী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৯-এ, সরকার বাই লেন, কলিকাতা-৭, মিহির প্রেস হইতে শ্রীসত্যচরণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

# সূচীপত্র

# সরল বিজ্ঞান-শিক্ষা

## ভূমিকা

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। কয়েক শতাব্দী পূর্বে যাহা মানুষের স্বপ্নের অগোচর ছিল, তাহা এখন বিজ্ঞানের কল্যাণে বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। আজ মানুষ নিজের বাসের জন্য গগনস্পর্শী সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য করিয়া প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিতেছে, ছায়াচিত্রে বিচিত্র ঘটনা দেখিতেছে এবং সবাক চিত্রে ও গ্রামোফোনে মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বেতার যন্ত্রে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দূর দেশের সহিত সংবাদ আদান-প্রদান চলিতেছে। বেতার যন্ত্রে মানুষ প্রত্যহ নানা সংবাদ পাইতেছে। বৈদ্যুতিক আলোয় মানুষ গৃহ আলোকিত করিতেছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষ জাহাজ, রেলগাড়ি, মটরগাড়ি ও বিমানে দ্রুত ভ্রমণ করিতেছে, রোগ নিরাময়ের জন্য নানাবিধ ঔষধ এবং যুদ্ধের জন্য টর্পেডো, আণবিক বোমা, বিষাক্ত গ্যাস আবিষ্কার করিতেছে। এইরূপে বিজ্ঞানের বিজয়-অভিযান অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে। বিজ্ঞান পৃথিবীর চেহারা এমন পরিবর্তন করিয়াছে যে একশত বৎসরের পূর্বেকার মৃত কোন লোক যদি হঠাৎ পৃথিবীতে আসিয়া হাজির হয়, তবে সে পৃথিবীকে চিনিতেই পারিবে না।

এবার তোমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে দুই একটি কথা বলিব। (১) বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে **নির্ভুল পর্যবেক্ষণ শক্তির অনুশীলন** করা দরকার। আমাদের চারিদিকে অহরহ কত যে বৈজ্ঞানিক ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। জলের মধ্যে ডুব দিলে আমাদের দেহের ভার যেন কমিয়া যায় মনে হয়। কেট্‌লিতে জল গরমের সময় বাষ্পের জোরে কেট্‌লির ঢাক্‌না কাঁপিতে থাকে। ঘাসের উপর কোন জিনিষ চাপা দিলে কয়েক দিনে ঘাসের বর্ণ সাদা হয়। মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মির প্রখরতা বেশী, সকাল ও সন্ধ্যায় তাহা কম হয়। কোন জিনিষ উপর হইতে ছাড়িয়া দিলেই পড়িয়া যায়। তোমরা এই সকল ঘটনা খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করিবে। সামান্য ঘটনা নির্ভুল-ভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার ফলে জগতে কত মহাসত্য আবিষ্কার হইয়াছে, সেই বিষয় তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িয়াছ।

(২) **চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি** :—কোন ঘটনা শুধু পর্যবেক্ষণ করিলেই হইবে না। ঘটনাটি কেন হইল তাহা জানিতে চেষ্টা করিবে। নিউটন শুধু আপেল ফলটিকে পড়িতেই দেখেন নাই, তিনি দিনের পর দিন চিন্তা করিয়া তাহার কারণ আবিষ্কার করেন।

(৩) **পরীক্ষা করা** :—যতদূর সম্ভব নিজের হাতে পরীক্ষা (experiment) করিতে চেষ্টা করিবে। পরীক্ষা করিতে খুব আমোদও লাগিবে এবং শিক্ষাবিষয় চিত্তাকর্ষী ও সহজ হইবে।

## প্রথম অধ্যায়

# বায়ু

১। **বায়ুর উপাদান** ঃ—ভূ-পৃষ্ঠের চারিদিকে বায়ুর আবরণ আছে। ইহা ঊর্ধ্বে তিন শত মাইলের উপরও বিস্তৃত। আমরা এই বায়ু-সমুদ্রের তলদেশে বাস করি। বায়ু ব্যতীত আমরা একদণ্ডও বাঁচিতে পারি না। ইহা প্রাণী ও উদ্ভিদের শ্বাসকার্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন। একটি ইঁদুরকে বায়ু-নিরুদ্ধ স্থানে রাখিলে শ্বাসরোধ হইয়া মরিয়া যাইবে। বায়ু ব্যতীত কোন দ্রব্য জ্বলিতে পারে না। একটি জ্বলন্ত বাতির উপর একটি পাত্র চাপা দিলে বাতিটি ধীরে ধীরে নিভিয়া যায়।

বায়ুতে দুইটি প্রধান গ্যাস আছে—**অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন**। বায়ু এই দুই গ্যাসের মিশ্রণ। বায়ুর এক-পঞ্চমাংশ অক্সিজেন এবং চারি-পঞ্চমাংশ নাইট্রোজেন। ইহার অর্থ, প্রত্যেক একশত ঘনফুট বায়ুর মধ্যে প্রায় ২০ ঘনফুট অক্সিজেন এবং প্রায় ৮০ ঘনফুট নাইট্রোজেন থাকে। এই দুই গ্যাস ব্যতীত বায়ুতে অতি অল্প পরিমাণ **কার্বন ডাই-অক্সাইড,** জলীয় বাষ্প, ধূলিকণা ও **অন্যান্য** গ্যাস থাকে।

এই সকল গ্যাসের মধ্যে অক্সিজেন খুব সক্রিয় ও দরকারী গ্যাস। অক্সিজেন সহজেই অন্য পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়। বায়ুর এই উপাদানই শ্বাসকার্যে ও দহনের সহায়তা করে। আমরা আহার ও পানীয় ব্যতীত কয়েক দিন বাঁচিতে পারি কিন্তু বায়ুর অক্সিজেন ব্যতীত আমরা কয়েক মিনিটও বাঁচিতে পারি না। অক্সিজেন ব্যতীত আমরা কোন পদার্থও জ্বালাইতে পারি না।

নাইট্রোজেন নিষ্ক্রিয় পদার্থ। ইহা খুব অল্প পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়। ইহা দহনের কার্যে বা শ্বাসকার্যে সাহায্য করে না। তাই বলিয়া

মনে করিও না যে, নাইট্রোজেন অপ্রয়োজনীয় জিনিষ। ইহা পরোক্ষ-ভাবে আমাদের উপকার করে। অক্সিজেন তীব্র দাহক। নাইট্রোজেন অক্সিজেনকে পাতলা করিয়া দেয়। নাইট্রোজেন না থাকিলে বায়ুতে অক্সিজেনের ভাগ খুব বেশী হইত। ইহাতে শ্বাসকার্য এত দ্রুত হইত যে আমরা পুড়িয়া যাইতাম এবং দহন-কার্য এত দ্রুত হইত যে আমরা কোন পদার্থে আগুন লাগাইতে না লাগাইতে তাহা পুড়িয়া যাইত।

উদ্ভিদের ও প্রাণীর দেহ গঠনে প্রোটিন নামক নাইট্রোজেনের পদার্থ প্রয়োজন। এই নাইট্রোজেন আমরা বায়ু হইতে পাই।

প্রাণী ও উদ্ভিদ্ নিশ্বাসের সঙ্গে সর্বদা বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়িতেছে। বায়ুতে কোন জিনিষ জ্বলিলে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। কোন দ্রব্য পচিলে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশে। কারখানার নানা রকম গ্যাস বায়ুতে মিশে। সমুদ্র, নদী প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন জলীয় বাষ্প সর্বদা বায়ুতে মিশে। জলীয় বাষ্প অদৃশ্য। প্রাণীর ও উদ্ভিদের দেহ হইতে জলীয় বাষ্প বাহির হইয়া বায়ুতে মিশিতেছে।

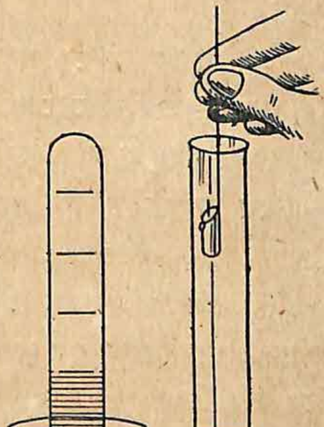
**কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন চিনিবার** (detecting) **পরীক্ষা**

(১) **চূণের জলের পরীক্ষা** ( Lime water experiment ) : সামান্য কলিচূণে প্রচুর জল ঢাল। কলিচূণ জলে দ্রবীভূত হয়। উপরাংশের পরিষ্কার জলকে চূণের জল বলে। এই চূণের জলকে একটি চওড়া পাত্রে রাখিয়া দাও। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে চূণের জলের উপর একটি সাদা সর পড়িয়াছে। কেন এমন হইল ? বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত চূণের সঙ্গে মিশিয়া ক্যাল্‌শিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত করে। ইহাকে আমরা সাধারণ কথায় খড়িমাটি বলি। জলে অদ্রাব্য ও সাদা বলিয়া ইহা সাদা সরের মত

জলের উপর ভাসিতে থাকে। ইহাতে জল ঘোলাটে হয়। এই পরীক্ষা দ্বারা কার্বন ডাই-অক্সাইডের অস্তিত্ব বুঝা যায়।

(২) **ক্ষারীয় প্যাইরোগ্যালেট** ( Alkaline Pyrogallate ) **পরীক্ষা** ঃ অক্সিজেন ক্ষারীয় প্যাইরোগ্যালেট দ্বারা শোষিত হয়। এই ঘটনার উপর নিম্নোক্ত পরীক্ষা নির্ভর করে।

(ক) একটি ১৮" ইঞ্চি দীর্ঘ এক মুখবদ্ধ নল লও। ইহাকে রবারের বা কাগজের আংটা দিয়া ছয় সমান ভাগে বিভক্ত কর। অতিরিক্ত কস্টিক পটাশ দ্রবের ( solution ) মধ্যে প্যাইরোগ্যালিক অম্ল মিশ্রিত কর। প্যাইরোগ্যালিক অম্ল কস্টিক পটাশে দ্রবীভূত হয়। কস্টিক পটাশকে ক্ষার ( alkali ) বলে। সেইজন্য কস্টিক পটাশে প্যাইরোগ্যালিক অম্লের দ্রবকে ক্ষারীয় প্যাইরোগ্যালিক দ্রব বলে। নলের এক ভাগ এই দ্রব দিয়া পূর্ণ কর। বাকি পাঁচ ভাগে বায়ু আছে। নলের খোলা মুখ বুড়া আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া ধর। নলকে ভালভাবে নাড়িয়া দাও। প্যাইরো-গ্যালেট দ্রব বায়ুর অক্সিজেনকে শোষণ করিয়া লয়। সেইজন্য প্যাইরোগ্যালেটের বর্ণ বাদামি হয়।



১নং চিত্র—প্যাইরোগ্যালেট পরীক্ষা

এইবার নলের খোলা মুখ পূর্বের ন্যায় চাপিয়া ধরিয়া দীর্ঘ পাত্রের

জলের মধ্যে উল্টাইয়া রাখ। আঙ্গুল ছাড়িয়া দাও। নলকে নামাইয়া বা উঠাইয়া নলের বাহিরে ও ভিতরে জলতল সমান কর। এখন দেখ জলতল খোলামুখ হইতে দ্বিতীয় দাগ পর্যন্ত উঠিয়াছে অর্থাৎ পাঁচ ভাগের এক ভাগ জল দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। কেন এমন হইল ? পাঁচ ভাগ বায়ুর মধ্যে যেটুকু অক্সিজেন থাকে, তাহা ক্ষারীয় প্যাইরোগ্যালেট দ্বারা শোষিত হয়। প্যাইরোগ্যালেটের বর্ণ বাদামি হয়। জল এই শূন্য স্থান পূর্ণ করে। অতএব বায়ুর **পাঁচ ভাগের এক ভাগ অক্সিজেন এবং বাকি চারি ভাগ নাইট্রোজেন।**

(খ) এইরূপ একটি নলে খানিকটা ক্ষারীয় প্যাইরোগ্যালেট দ্রব লইয়া মুখ আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া খুব নাড়। আঙ্গুল সরাইয়া তৎক্ষণাৎ একটি জ্বলন্ত কাঠি উহার ভিতর ঢুকাইয়া দাও। উহা নিভিয়া যাইবে। অর্থাৎ অবশিষ্ট নাইট্রোজেন দহনের সাহায্য করে না। ইহা নিষ্ক্রিয় গ্যাস।

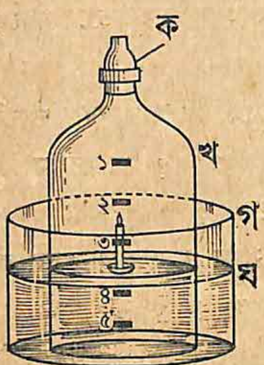
এই পরীক্ষা হইতে প্রমাণ হয় যে, (১) বায়ুর $\frac{১}{৫}$ ভাগ অক্সিজেন, (২) বায়ুর $\frac{৪}{৫}$ ভাগ নাইট্রোজেন এবং (৩) নাইট্রোজেন নিষ্ক্রিয় গ্যাস।

(৩) নাইট্রিক অক্সাইড নামক গ্যাস অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিলে লাল্‌চে বাদামি বর্ণের ধোঁয়া উৎপন্ন হয়। এই পরীক্ষা দ্বারাও বায়ুতে অক্সিজেনের অস্তিত্ব বুঝা যায়।

(৪) **বাতির দহন** ( Burning of a candle ): একটি বড় পাত্রে (গ) খানিকটা জল লও। একটি চীনামাটির বাটিতে ( basin ) একটি বাতি বসাও। বাতিসমেত বাটি জলে ভাসাইয়া দাও।

আর একটি দীর্ঘ পাত্র (খ) লও। এই পাত্রের মাথায় একটি বড় ফাঁক (ক) আছে। এই ফাঁক কাচের ছিপি (stopper) দিয়া বন্ধ করা যায়। বাতির উপর দীর্ঘ পাত্রটি ঢাকা দাও। পাত্রের যে অংশ জলতলের উপর থাকে, তাহা পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া চিহ্নিত কর। ছিপি খুলিয়া

বাতি জ্বালাইয়া দাও, ছিপি বন্ধ কর। বাতির শিখা ক্ষুদ্রতর হইতে হইতে একেবারে নিভিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে যে জল উপর দিকে উঠিয়া পাত্রের প্রায় এক ভাগ পর্যন্ত ভরিয়া ফেলিয়াছে। ছিপি খুলিয়া তৎক্ষণাৎ পাত্রের মধ্যে একটি জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইলে উহা নিভিয়া যায়। কেন এমন হয়? পাত্রের বায়ুর অক্সিজেন বাতির দহনে ব্যয়িত হইয়াছে। ইহার শূন্য স্থান জল পূর্ণ করিয়াছে। সুতরাং **বায়ুর পাঁচ ভাগের এক ভাগ অক্সিজেন, বাকি চারি ভাগ নাইট্রোজেন**। ইহা দহনে সাহায্য করে না। *




২নং চিত্র—বাতির দহন

বায়ুতে **জলীয় বাষ্পের অস্তিত্ব** নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা বুঝা যায় ঃ—

একটি কাচপাত্রে খানিকটা বরফ ও জল লও। পাত্রের বহির্গাত্রে ফোঁটা ফোঁটা জলবিন্দু দেখা যায়। পাত্রের ভিতরকার জল পাত্রের গাত্র ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে পারে না। তবে এই জল কোথা হইতে আসিল? বায়ুতে যে অদৃশ্য জলীয় বাষ্প আছে, তাহা পাত্রের শীতল গাত্রের সংস্পর্শে আসিয়া জমিয়া জল হয়।



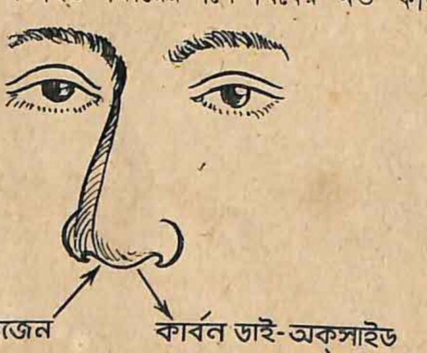
৩নং চিত্র

---

* বাতির দহনে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন হয়, তাহা পরে 'দহনের' ( combustion ) বিবরণে বলা হইয়াছে।

বায়ুতে **ধূলিকণার অস্তিত্ব** নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা বুঝা যায় ঃ—
দিনের বেলা অন্ধকার ঘরে জানালার ফাঁক দিয়া সূর্যের আলো আসিতে দাও। সূর্যের রশ্মিতে ধূলিকণাগুলিকে সুন্দরভাবে নাচিতে দেখিবে।

২। **শ্বাসকার্য** (Respiration) ঃ **জীবের সঙ্গে বায়ুর সম্পর্ক** ঃ বায়ু ছাড়া আমরা একদণ্ড বাঁচিতে পারি না। কেন? আমরা নাকের ছিদ্রের মধ্য দিয়া (কখন কখন মুখ দিয়া) যে বায়ু গ্রহণ করি, তাহা ফুস্‌ফুসে চলিয়া যায়। ফুস্‌ফুসের অতি সূক্ষ্ম নালীর বা জালকের (Capillaries) মধ্য দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয়। এই রক্তের দ্বারা অক্সিজেন শোষিত হয়। রক্তের সহিত অক্সিজেন দেহের সর্বত্র সঞ্চারিত হয়। অক্সিজেন আহারের উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল, তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে। কার্বন ডাই-অক্সাইড শরীরের পক্ষে বিষের মত কাজ করে। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প রক্তের সহিত ফুস্‌ফুসে আসে এবং নিশ্বাসের সঙ্গে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। নিশ্বাস-বায়ুর উষ্ণতাও একটু বাড়ে। ইহাকে **শ্বাসকার্য** বলে। সুতরাং শ্বাসকার্য হইতেছে বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ, বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ও একটু তাপ ত্যাগ। শ্বাসকার্য দ্বারা রক্ত শোধিত হয় এবং দেহের কতক বিষাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া যায়।



৪নং চিত্র—ডুই নাক দিয়া নিশ্বাস ও প্রশ্বাস

এইবার তোমরা বুঝিতেছ কেন আমরা বায়ু ব্যতীত বাঁচিতে পারি না। যখন মুমূর্ষু রোগীর শ্বাসকষ্ট হয় তখন কৃত্রিম উপায়ে তাহাকে অক্সিজেন দেওয়া হয়।

আমাদের মত প্রত্যেক প্রাণীই বায়ু দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। জলচর প্রাণী, যেমন মাছ, জলে দ্রবীভূত বায়ু দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়।

শুধু প্রাণী কেন, উদ্ভিদ্‌ও পাতার রন্ধ্র বা ত্বকের ছিদ্র দিয়া বায়ু গ্রহণ করে। এই বায়ুর অক্সিজেন উদ্ভিদ্-দেহের উপাদানের সহিত যুক্ত হয়। ইহাতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয় এবং তাপ ও শক্তির উদ্ভব হয়। শ্বাসকার্য ছাড়া কোন উদ্ভিদ্‌ও বাঁচিতে পারে না। জীবের এই শ্বাসকার্য দিবারাত্রি চলে।

**পরীক্ষা ঃ** একটি দুই মুখ খোলা নলের এক প্রান্ত তোমার মুখে পুরিয়া অপর প্রান্ত পরিষ্কার চূণের জলের মধ্যে ডুবাও। মুখ দিয়া ফুঁ দাও। চূণের জল ঘোলাটে হয়। কেন? নিশ্বাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড চূণের জলকে ঘোলাটে করে।

**পরীক্ষা ঃ** একটি পরিষ্কার আয়নার কাচের উপর জোরে নিশ্বাস ফেলিলে কাচের উপর জলীয় বাষ্প জমে।

**পরীক্ষা ঃ** তোমার হাতের তালুতে জোরে নিশ্বাস ত্যাগ কর। দেখ তালু উষ্ণ বোধ হয়।



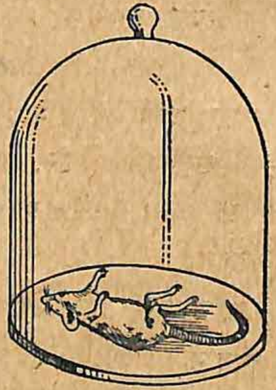
৫নং চিত্র—নিশ্বাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড চূণের জলকে ঘোলাটে করিতেছে।

এই তিনটি পরীক্ষা হইতে বুঝা যায়, শ্বাসকার্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ও তাপ উৎপন্ন হয়।

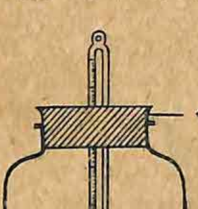
**পরীক্ষা ঃ** একটি ইঁদুরকে বায়ু-নিরুদ্ধ কাচপাত্রে চাপা দাও। কিছুক্ষণ পরে দেখ ইহা বায়ুর অভাবে দমবন্ধ হইয়া মরিয়া গিয়াছে।

আমরাও জলের নীচে থাকিলে বায়ুর অভাবে আমাদের দম আট্‌কাইয়া আসে।

**পরীক্ষা** ঃ একটি বড় বোতলে (খ) কতকগুলি অঙ্কুরিত মটর বীজ (গ) রাখ। ইহার মুখ ছিপি (ক) দিয়া বন্ধ কর। ছিপির মধ্য দিয়া একটি থার্মমিটার ঢুকাইয়া দাও যাহাতে থার্মমিটারের কুণ্ড বীজগুলির মধ্যে থাকে। কয়েক ঘণ্টা পরে থার্মমিটারে উষ্ণতা-বৃদ্ধি দেখা যায়। ছিপি খুলিয়া বোতলে অল্প পরিষ্কার চূণের জল ঢাল। ইহা ঘোলাটে হয়। কেন এরূপ হয়? মটর বীজ শ্বাসকার্যের জন্য বোতলের বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করে



৬নং চিত্র




৭নং চিত্র—
উদ্ভিদের শ্বাসকার্য

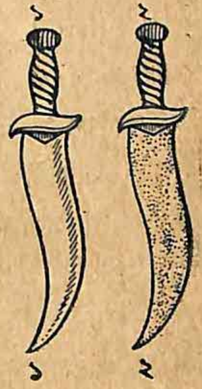
এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড চূণের জলকে ঘোলাটে করে। বীজের শ্বাসকার্যের সময় তাপের উদ্ভব হয় (৭নং চিত্র)।

উদ্ভিদ্ আমাদের খুব উপকার করে। উদ্ভিদ্ বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে কার্বন গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়। এই বিষয়ে তোমরা পরে জানিবে।

এখন বায়ুর সহিত জীবের কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহা বুঝিতে পারিলে।

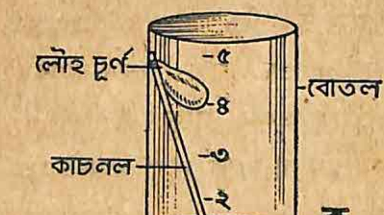
৩। **লোহার মরিচা** ( Rusting of iron ) ঃ তোমরা একটি চক্‌চকে ছোরা আর্দ্র বায়ুতে রাখিয়া দাও। কয়েক দিন পরে দেখিবে

ইহার উজ্জ্বলতা নষ্ট হইয়াছে। ইহার গায়ে লাল্‌চে আবরণ পড়িয়াছে। এই আবরণকে **মরিচা** বলে। ইহা বায়ুর অক্সিজেনের ও জলীয় বাষ্পের সহিত লোহার রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তুত হয় (৮নং চিত্র)।



৮নং চিত্র

**পরীক্ষা** ঃ কতকগুলি চক্‌চকে লোহার ভিজা গুঁড়া একটি থলিতে লইয়া একটি কাচ-দণ্ডে বাঁধ। তৎপরে চিত্রে প্রদর্শিত উপায়ে থলিসমেত দণ্ডটি একটি বড় বোতলে রাখ। বোতলকে একটি জলপূর্ণ পাত্রে উল্টাইয়া দাও। জল বোতলের বাহির ও ভিতর একই সমতলে থাকে। বোতলের জলের উপরের অংশ পাঁচ সমান ভাগে বিভক্ত কর। কয়েক দিন পরে দেখ জলতল বোতলের ভিতর এক অংশ উপরে উঠিয়াছে। কেন এমন হয়? লোহা বোতলের ভিতরের বায়ুর অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হয়। অক্সিজেন বায়ুর $\frac{১}{৫}$ ভাগ অংশ দখল করে। জল এই শূন্য স্থান পূরণ করে। থলি খুলিয়া দেখ কতকগুলি লোহার গুঁড়া লাল্‌চে হইয়াছে। ঐ লাল্‌চে অংশই মরিচা।



৯নং চিত্র—মরিচায় অক্সিজেন দরকার

**পরীক্ষা** ঃ একটি কাচের পাত্রে কতকগুলি নূতন চক্‌চকে লোহার গুঁড়া রাখিয়া পাত্রে জল ঢাল। জলকে ফুটাও। জলের দ্রবীভূত বায়ু বুদবুদের আকারে বাহির হইয়া যায়। পাত্রের মুখ

ছিপি দিয়া বন্ধ কর। তাপ বন্ধ কর। পাত্রের ভিতর জল ও জলীয় বাষ্প থাকিল। পাত্রের ভিতর বায়ু ( অক্সিজেন ) না থাকায় এই লোহায় কখনও মরিচা পড়ে না।

**পরীক্ষা**ঃ একটি শুষ্ক পাত্রে কতকগুলি শুষ্ক লোহার গুঁড়া রাখিয়া পাত্রটিকে উষ্ণ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখ। পাত্রের ভিতর জলের বা জলীয় বাষ্প না থাকায় এই লোহায় কখনও মরিচা পড়ে না।

এই দুই পরীক্ষা প্রমাণ করে যে, **লোহায় মরিচা পড়িবার জন্য জল ও অক্সিজেন দুই-ই প্রয়োজন**।

**পরীক্ষা**ঃ একটি চীনামাটির পাত্রে কতকগুলি টাট্‌কা শুষ্ক লোহার গুঁড়া রাখিয়া ওজন কর। কয়েক দিন লোহার গুঁড়াকে একটু সিক্ত করিয়া বায়ুতে রাখিয়া দাও। লোহায় মরিচা পড়ে। জলকে তাপ দিয়া তাড়াইয়া দাও, পাত্র ঠাণ্ডা করিয়া ওজন কর, ওজন বাড়ে। লোহার সহিত অক্সিজেনের সংযোগ হওয়ায় ওজন বাড়ে।

লোহা ও মরিচা এক পদার্থ নয়। লোহা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় কিন্তু মরিচা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না।

লোহার জিনিষে রং বা আল্‌কাতরা লাগাইয়া মরিচা পড়া বন্ধ করা হয়।

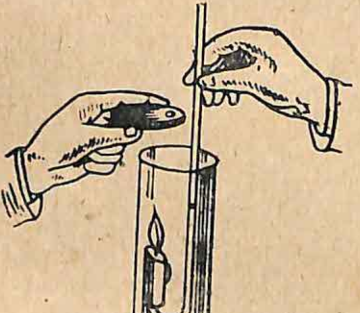
৪। **দহন** ( Combustion ) ঃ (ক) **জ্বলন্ত পদার্থ বায়ু গ্রহণ করে**ঃ কাগজ, কাপড়, কাঠ, কেরোসিন তৈল, মোমবাতি প্রভৃতি পদার্থে আগুন ধরাইলে তাহা জ্বলিতে থাকে এবং আমরা আলো ও তাপ পাই। ইহাকে **দহন** বলে। কাগজ, কাপড় ইত্যাদিকে **দাহ্য** পদার্থ বলে। কেরোসিন তৈল, মোমবাতি প্রভৃতিতে কার্বন ও হাইড্রোজেন থাকে। দহনের সময় বায়ুর অক্সিজেন এই কার্বন ও হাইড্রোজেনের সঙ্গে দ্রুত রাসায়নিকভাবে যুক্ত হইয়া যথাক্রমে কার্বন ডাই-অক্সাইড

ও জল উৎপন্ন করে। এই রাসায়নিক ক্রিয়া এত তীব্র হয় যে উহাতে আলো ও তাপ উদ্ভূত হয়। সাধারণত বায়ুর অক্সিজেন ব্যতীত দাহ্য পদার্থ জ্বলে না। সেইজন্য কোন জ্বলন্ত পদার্থ চাপা দিলে বায়ুর সংযোগ বন্ধ হওয়ায় উহা নিভিয়া যায়। কাপড়ে আগুন লাগিলে তাহাতে লেপ চাপা দিলে উহা নিভিয়া যায়। বায়ু ঢুকিবার জন্য উনানের নীচে ফাঁক থাকে।



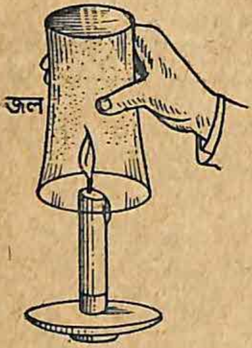

১০নং চিত্র—দহনে অক্সিজেন দরকার

**পরীক্ষা ঃ** (১) একটি শক্ত তামার তারের এক প্রান্তে এক টুক্‌রা জ্বলন্ত বাতি রাখ। তারের অপর প্রান্তে একটি কার্ডবোর্ডে ছিদ্র করিয়া এমনভাবে বসাও যেন বাতিসমেত তারকে একটি দীর্ঘ পাত্রের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলে কার্ডবোর্ড সম্পূর্ণরূপে পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। বাতির শিখা ক্রমশ নিষ্প্রভ হইয়া নিভিয়া যায়। পাত্র হইতে তাড়াতাড়ি বাতি বাহির করিয়া পাত্রের মুখ একটি কাচের চাকতি দিয়া ঢাকিয়া তাড়াতাড়ি বাতিটি জ্বালিয়া পুনরায় পাত্রের মধ্যে রাখিলে ইহা নিভিয়া যায়। এখন ঐ পাত্রের মধ্যে পরিষ্কার চূণের জল দিয়া নাড়িলে ইহা ঘোলাটে হয়।



১১নং চিত্র—দহনে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়

(২) একটি জ্বলন্ত বাতির উপর একটি ঠাণ্ডা গ্লাস ধর। গ্লাসের ভিতর গায়ে জলীয় বাষ্প জলবিন্দুরূপে জমে। কেন এই সব ঘটনা ঘটে? বাতির মধ্যের কার্বন ও হাইড্রোজেন বায়ুর অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া যথাক্রমে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন করে। কার্বন ডাই-অক্সাইড চূণের জলকে ঘোলাটে করে। বায়ুর বাকি গ্যাস (নাইট্রোজেন) দহনের সহায়তা করে না বলিয়া পুনঃপ্রজ্বলিত বাতি নিভিয়া যায়।



১২নং চিত্র – দহনে জলীয় বাষ্পের উৎপত্তি

**বাতি = কার্বন + হাইড্রোজেন**
**কার্বন + অক্সিজেন = কার্বন ডাই-অক্সাইড**
**হাইড্রোজেন + অক্সিজেন = জল**

আলো ও তাপ উৎপন্ন হইলেই তাহাকে দহন বলে না। দহনের সময় রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে। তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে আলো ও তাপ উদ্ভূত হয় কিন্তু ইহাকে দহন বলে না।

আবার কতকগুলি দ্রব্য যথা, এণ্টিমনি ক্লোরিণ গ্যাসে জ্বলিতে থাকে, এখানে অক্সিজেন দরকার হয় না। সুতরাং **যে-কোন রাসায়নিক পরিবর্তনে আলো ও তাপ উদ্ভূত হইলে তাহাকে দহন বলে।**

(খ) **শ্বাসকার্য:** আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, শ্বাসকার্যে ফুস্‌ফুসের বায়ুর অক্সিজেন আহার্য দ্রব্যের কার্বন ও হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত হইয়া যথাক্রমে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন করে। এই সঙ্গে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়। শ্বাসকার্যের সময় যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্বে পরীক্ষা দ্বারা দেখান হইয়াছে। অক্সিজেন ব্যতীত যেমন বাতি নিভিয়া যায়, অক্সিজেন ব্যতীত আমাদের জীবন-দীপও নিভিয়া

যায়। সুতরাং শ্বাসকার্য একপ্রকার মৃদু দহন। নিম্নে শ্বাসকার্য ও দহনের তুলনা করা গেল :—

| দহন | শ্বাসকার্য |
|---|---|
| ১। দহনের সময় দাহ্য পদার্থের সহিত অক্সিজেনের দ্রুত রাসায়নিক ক্রিয়া হয়। | ১। শ্বাসকার্যে দেহের ও রক্ত মধ্যস্থ কার্বনের সহিত অক্সিজেনের মৃদু রাসায়নিক ক্রিয়া হয়। |
| ২। দহনকালে আলো ও তাপের উদ্ভব হয় এবং নানাবিধ গ্যাস উৎপন্ন হয়। | ২। শ্বাসকার্যে কেবল তাপের সৃষ্টি হয় এবং প্রধানত কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। |
| ৩। দহনকার্যে সাধারণত অগ্নিসংযোগ দরকার হয়। | ৩। শ্বাসকার্যে অগ্নিসংযোগ দরকার হয় না। |

(গ) **দহন ও মরিচার তুলনা** : আমরা দেখিয়াছি যে মরিচা পড়িবার সময় বায়ুর অক্সিজেন লোহার সহিত যুক্ত হয়। ইহাতে সামান্য তাপেরও উদ্ভব হয়। সুতরাং মরিচা-পড়া একপ্রকার দহন। দহন ও মরিচার তুলনা নিম্নে দিলাম :—

| দহন | মরিচা |
|---|---|
| ১। দহনে বায়ুর সক্রিয় অংশ অক্সিজেন দ্রুত দাহ্য পদার্থের সহিত যুক্ত হয়। | ১। মরিচাতে বায়ুর সক্রিয় অংশ অক্সিজেন ধীরে ধীরে লোহার সহিত যুক্ত হয়। |
| ২। দহনের পর অবশিষ্ট গ্যাস দহনে সাহায্য করে না। | ২। মরিচার পর অবশিষ্ট গ্যাস দহনে সাহায্য করে না। |
| ৩। দহনে তীব্র তাপ ও আলো উদ্ভূত হয়। | ৩। মরিচায় সামান্য তাপ উদ্ভূত হয়, কিন্তু কোন আলো উদ্ভূত হয় না। |
| ৪। দহনে অগ্নিসংযোগ দরকার হয় কিন্তু জলের দরকার হয় না। | ৪। মরিচায় অগ্নিসংযোগ দরকার হয় না, কিন্তু সামান্য জল দরকার হয়। |

৫। **বায়ু-সঞ্চালন** ( Ventilation ) ঃ (ক) **বায়ু-সঞ্চালনের সাধারণ নীতি ও মানবের স্বাস্থ্যের উপর ইহার প্রভাব** ঃ আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, শ্বাসকার্যের ফলে নিশ্বাস-বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাস থাকে। নিশ্বাস-বায়ুর তাপও একটু বেশী থাকে। এই গ্যাসগুলি, বিশেষত কার্বন ডাই-অক্সাইড, মানবের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব অনিষ্টকর। ইহাতে জীব দম আট্‌কাইয়া মরিয়া যায়। একটি ঘরে কতকগুলি লোক থাকিলে তাহাদের নিশ্বাসে ঘরের বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়িতে থাকে, ঘরের উষ্ণতাও বাড়িতে থাকে এবং ঘরে অক্সিজেনের ভাগ কমিতে থাকে। বার বার এই বিষাক্ত বায়ু সেবন করিয়া লোকগুলি ক্রমশ গরম ও অসুস্থ বোধ করে। তাহাদের মাথা ঘুরে, গা বমি বমি করে, শেষে যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ফুস্‌ফুসের পীড়ায় আক্রান্ত হয়। ঘরেও দুর্গন্ধ বাহির হয়। একটি বোতলে যদি কয়েক দিন নিশ্বাস-বায়ু আট্‌কাইয়া রাখ, দেখিবে বায়ু হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে।

অতএব আমাদের সব সময়েই ঘর হইতে দূষিত গরম বায়ু বাহির করিবার এবং ঘরে বিশুদ্ধ শীতল বায়ু ঢুকাইবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই ব্যবস্থাকে **বায়ু-সঞ্চালন** বলে।

(খ) **উষ্ণ বায়ু উপরের দিকে উঠে এবং শীতল বায়ু নীচের দিকে নামে** ঃ হাল্‌কা জিনিষ সব সময়েই উপরে যাইতে চায়। শোলা, কাগজ জলের চেয়ে হাল্‌কা বলিয়া জলের উপর ভাসে। বায়ুর বেলায়ও এই নিয়ম খাটে। প্রত্যেক জিনিষ উষ্ণ হইলে আয়তনে বাড়ে অর্থাৎ হাল্‌কা হয়। বায়ুও উষ্ণ হইলে প্রসারিত ও হাল্‌কা হয় এবং ঊর্ধ্ব দিকে উঠিয়া যায়। শীতল বায়ু অপেক্ষাকৃত ভারী হয়। ইহা নিম্নদিকে নামিতে থাকে এবং উপরোক্ত উষ্ণ বায়ুর স্থান অধিকার করে। এইরূপে **বায়ু-প্রবাহের** সৃষ্টি হয়।

**পরীক্ষা ঃ** একটি ল্যাম্প আলো জ্বাল। আলোর চিমনির খোলা মুখের ঠিক উপরে কয়েক টুক্‌রা কাগজ ছাড়িয়া দিলে টুক্‌রাগুলি উপরে উঠিয়া যাইবে। কেন এমন হয়? দীপ শিখার তাপে চিমনির ভিতরের বায়ু প্রসারিত ও হাল্‌কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। সুতরাং উর্ধ্বগামী বায়ু কাগজের টুক্‌রা-গুলিকে ঠেলিয়া তুলে। বাহিরের শীতল বায়ু চিমনির তলা দিয়া ভিতরে ঢোকে এবং ইহাও উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। এইরূপ চিমনির ভিতর দিয়া একটি বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

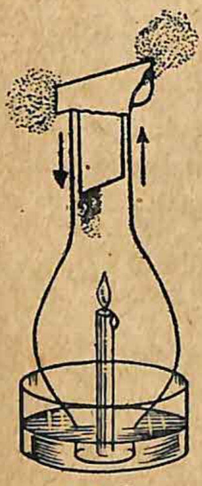


১৩নং চিত্র

**পরীক্ষা ঃ** একটি পাত্রে জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া জল ঢাল। পাত্রে একটি চিমনি রাখ যাহাতে বাতিটি চিমনির মাঝখানে থাকে। জলের জন্য নীচে হইতে চিমনিতে বায়ু ঢোকে না। ফলে বাতি নিভিয়া যায়।

বাতিটি পুনরায় জ্বাল (১৪নং চিত্র)। চিমনির মুখে মাঝামাঝি একটি T আকারের কার্ডবোর্ড রাখ। বাতি জ্বলিতে থাকে। কেন এমন হয়? কার্ডবোর্ডের এক ধার দিয়া বাহিরের শীতল বায়ু চিমনির ভিতর দিকে নামিয়া আসে এবং অপর ধার দিয়া চিমনির ভিতরের উষ্ণ বায়ু উপর দিকে উঠিয়া যায়। চিমনিতে দুইটি বায়ু-প্রবাহ সৃষ্ট হয়—একটি নিম্নগামী, অপরটি উর্ধ্বগামী। একখণ্ড ধূমায়মান কাগজ চিমনির মুখের কাছে ধরিলে ধোঁয়া একদিক দিয়া চিমনির ভিতর ঢুকিবে ও অপর দিক দিয়া বাহির হইবে।

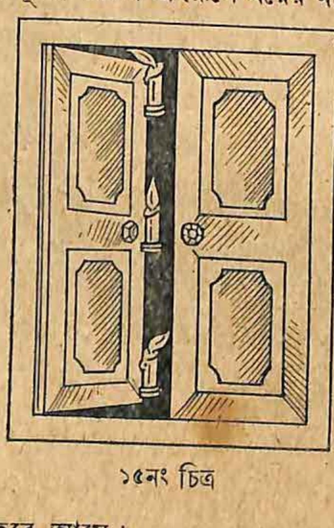
উনানে আগুন দিলে কয়লার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা লইয়া উত্তপ্ত বায়ু উপর দিকে উঠে। এই কণাগুলিই ধোঁয়ার সৃষ্টি করে। কোন স্থানে আগুন লাগিলে বায়ু ভীষণভাবে উত্তপ্ত হইয়া দ্রুত উপরের দিকে উঠিয়া যায় এবং চারিপাশের বায়ু প্রবলবেগে আগুনের দিকে ছুটিয়া আসে।



১৪নং চিত্র

(গ) **বাসঘর ও রান্নাঘরের বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা** : এই ব্যবস্থা উষ্ণ বায়ুর ঊর্ধ্বগতি ও নিম্ন বায়ুর নিম্নগতির উপর নির্ভর করে। বাসঘরে মানুষের সংস্পর্শে ও নিশ্বাসে ভিতরের বায়ু উত্তপ্ত ও দূষিত হয়। এই উত্তপ্ত বায়ু হাল্‌কা হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায়। বাহির হইতে ঘরের নীচের দিক দিয়া শীতল ভারী বায়ু ঢুকিয়া সেই স্থান পূরণ করে। এইরূপে ঘরের মধ্যে একটি বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

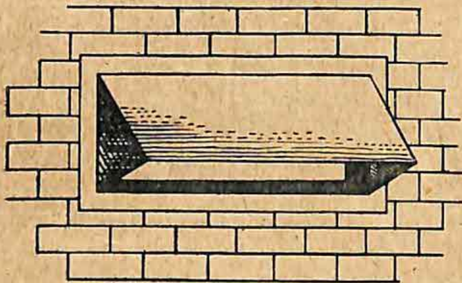
**পরীক্ষা** : যে সময় জোরে হাওয়া বহে না, সেই সময়ে রাত্রে বন্ধ ঘরের দরজা আধ খোলা রাখিয়া একটি মোমবাতি দরজার উপর দিকে রাখিলে শিখা বাহিরের দিকে বাঁকে। নীচের দিকে শিখা ভিতরের দিকে বাঁকে, মাঝে শিখা সোজা থাকে। অর্থাৎ উপর দিয়া উষ্ণ বায়ু বাহিরে আসে এবং নীচ দিয়া শীতল বায়ু ভিতরে আসে।



১৫নং চিত্র

বায়ু-সঞ্চালন দুই উপায়ে হয়। **স্বাভাবিক উপায়ঃ** সূর্যতাপে কোনও স্থান উত্তপ্ত হইলে বায়ুও উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। তৎস্থানে শীতল বায়ু আসে। ঝড়ের সময়ও সকল স্থানের বদ্ধ ও দূষিত বায়ু বিতাড়িত হয়। স্বাভাবিক উপায়ে বায়ু-সঞ্চালন বিনা বাধায় হইবার জন্য ঘরের চারিপাশে কোন বড় গাছপালা রাখিবে না।

**কৃত্রিম উপায়ঃ** দূষিত ও উষ্ণ বায়ু বাহির হইবার জন্য ছাদের নীচে দেওয়ালে জাল-আঁটা বা কাচের ঘুলঘুলি (Ventilaton) থাকে। অনেক সময়দেওয়ালে বড় গোলাকার বিদ্যুৎ-চালিত পাখা দিয়া বায়ু বাহির করিবার ও ঢুকাইবার ব্যবস্থা থাকে। বিশুদ্ধ শীতল বায়ু ঢুকিবার জন্য দেওয়ালের নীচে ঘুলঘুলি এবং ঘরে উপযুক্ত সংখ্যক ও উপযুক্ত মাপের জানালা বসান দরকার। জানালাগুলি রুজু রুজু হওয়া দরকার। জানালাগুলি নিয়মমত খোলা রাখা উচিত। শোওয়ার ঘরে আসবাবপত্র কম রাখিবে, ইহাতে বায়ু-চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে না। টানা পাখা বা ইলেক্‌ট্রিক পাখার সাহায্যেও ঘরে বায়ু-সঞ্চালন সাধিত হয়।



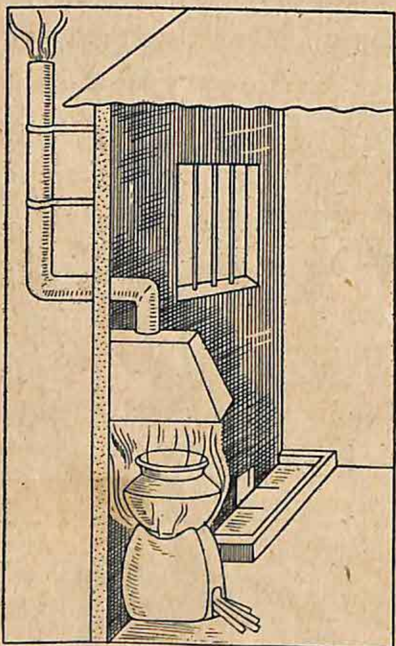
১৬নং চিত্র—কাচের ঘুলঘুলি



১৭নং চিত্র—দেওয়ালে বিদ্যুৎ-চালিত পাখা

ঘরের চারিপাশে কোন বড় গাছপালা রাখিতে নাই। ইহাতে ঘরে বায়ু-সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়।

**রান্নাঘরে বায়ু-চলাচল ঃ** রান্নাঘরে উনানে অনবরত কয়লা পোড়ে। ইহাতে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। তা-ছাড়া কয়লার গুঁড়া ধোঁয়ারূপে বাহির হয়। ইহারা উভয়েই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। উনানের ধোঁয়া বাহির করিবার চিমনি বা নলের ব্যবস্থা থাকা দরকার। রান্নাঘরখানি প্রশস্ত হওয়া দরকার এবং বড় জানালা রাখা দরকার। ইহাতে সব সময়েই প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু ঘরে ঢোকে।



১৮নং চিত্র—রান্নাঘরের চিমনি

আজকাল সিনেমা হল বা যেখানে বহু লোকের সমাগম হয়, সেই ঘরগুলির বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইহাকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ( Air-condition ) বলে। ইহাতে চারিটি উপকার হয়—(১) ইহাতে ঘরের উষ্ণতা দেহোপযোগী হয়, (২) ইহা আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে, (৩) ইহা বায়ুকে গতিশীল রাখে এবং (৪) ইহা বায়ুকে ধূলিকণা মুক্ত করে।

**শক্তি সরবরাহকরূপে বায়ুকল** ( Wind-mill as generator of energy ) ঃ বায়ু আমাদের অনেক উপকার করে। একটি

উপকার শ্বাসকার্যের ও দহনের জন্য অক্সিজেন সরবরাহ। এই বিষয়ে পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে। এইবার আর একটি উপকারের কথা বলিব। অনেক দেশে যথা হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ইউকাটনে বারো মাস নিয়মিত বায়ু প্রবাহিত হয় এবং অতি বেগে প্রবাহিত হয়। বায়ুর এই প্রবল গতি হইতে আমরা কল চালাইবার শক্তি সংগ্রহ করি। প্রবহমান বায়ু কতকগুলি পাখার ( blades ) গায়ে প্রবলবেগে আঘাত করে। বায়ু উঁচু জায়গা দিয়া অবাধে প্রবাহিত হয়; সেইজন্য পাখাগুলিকে খুব উঁচু জায়গায় দৃঢ়ভাবে বসান হয়। পাখাগুলি একটি কেন্দ্রীয় দণ্ডে লাগান থাকে। পাখাগুলি জোরে ঘুরিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় দণ্ডটিও ঘুরিতে থাকে।



১৯নং চিত্র—বায়ু-চালিত কল

দণ্ডটির সঙ্গে চওড়া ফিতা দিয়া যে-কোন চাকা যোগ করিলে চাকাও ঘুরিতে থাকে। এইরূপে আমরা বায়ুর গতিশক্তি হইতে যে-কোন কল চালাইতে পারি। আবার এই গতিশক্তি দ্বারা তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র বা ডায়নামো চালাইয়া তড়িৎ উৎপাদন করা হয়। এই তড়িৎ দিয়া আলো জ্বালিতে, পাখা চালাইতে বা কল চালাইতে পারা যায়।

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়

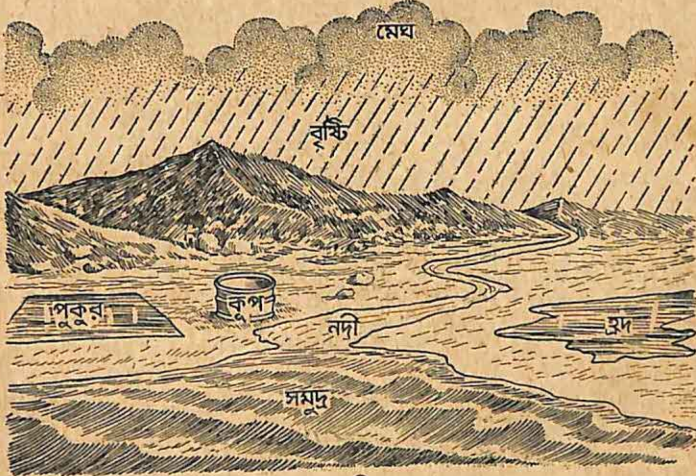
## জল

১। (ক) **জলের উৎপত্তি স্থান** (Sources of water) : আমরা সাধারণত নিম্নলিখিত স্থান হইতে জল পাইয়া থাকি :—

(ক) **বৃষ্টির জল**—বৃষ্টির জল স্বাভাবিক পাতিত জল। কারণ সমুদ্র, নদী প্রভৃতির জল সূর্যতাপে বাষ্পীভূত হইয়া উর্ধ্বে উঠিয়া যায়, তৎপরে সেই বাষ্প শীতল হইয়া মেঘ ও বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। বৃষ্টির জল বিশুদ্ধতম প্রাকৃতিক জল। তথাপি ইহাতে বায়ুর অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রিক অম্ল, অ্যামোনিয়া, ধূলিকণা, জীবাণু, কল-কারখানার ধোঁয়া ও অন্যান্য গ্যাস প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। বৃষ্টির প্রথম জলে ইহারা দ্রবীভূত হয়। পরবর্তী পশলার জল অনেকটা বিশুদ্ধ হয়। বৃষ্টির জলের কতকাংশ ধোয়ানীরূপে নদী বা অন্য জলাশয়ে পতিত হয়, আবার অধিকাংশ জল ভূগর্ভে শোষিত হয়।

(খ) **প্রস্রবণের জল**—ভূগর্ভে জল প্রবেশ করিয়া নিম্নদিকে যাইবার সময় ইহা সছিদ্র বিভিন্ন মৃত্তিকা স্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। মৃত্তিকা স্তর ছাঁকনির কাজ করে। ইহাতে জল স্বাভাবিকভাবে ছাঁকিয়া যায়। ইহাতে অদ্রাব্য পদার্থ থাকে না কিন্তু ইহা নানা রকম খনিজ লবণ দ্রবীভূত করে। এই জল স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। ইহা কোন অশোষক স্তরে পৌঁছাইলে ফাটল দিয়া উপরে উঠিয়া আসে। ইহাকে **প্রস্রবণ** বলে। ভূগর্ভে কূপ বা পুষ্করিণী খনন করিলে ভূনিম্নস্থ জলস্রোত হইতে আমরা জল পাই। আমাদের দেশে ভুবনেশ্বর, বক্রেশ্বর প্রভৃতি স্থানে এইরূপ প্রস্রবণ আছে। ইহাদের জল স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

(গ) **নদী ও পার্বত্য স্রোতস্বতীর জল**—বৃষ্টির জল ও বরফ-গলাজল ভূ-ভাগ ধৌত করিয়া নদীতে পড়ে। সুতরাং নদীর জলে অনেক অদ্রাব্য ও দ্রাব্য পদার্থ মিশিয়া থাকে। বর্ষাকালে নদীর জল একটি গ্লাসে রাখিয়া দিলে ভারী অদ্রাব্য পদার্থ গ্লাসের তলদেশে থিতাইয়া যায়।




২০নং চিত্র—জলের উৎস

(ঘ) **সাগরের জল**—নদীর জল সমস্ত দ্রাব্য ও অদ্রাব্য পদার্থ লইয়া সাগরে পড়িতেছে। সুতরাং সাগরের জলে অধিক পরিমাণ দ্রাব্য পদার্থ থাকে। এই সকল পদার্থের মধ্যে সাধারণ লবণ বেশী থাকে। সেইজন্য এই জল পানের ও রন্ধনের অনুপযোগী, তবে ইহাতে স্নান স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী।

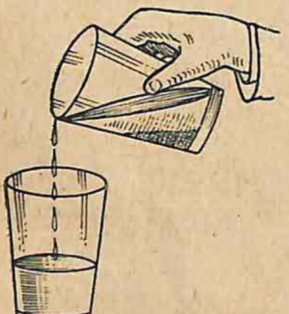
সমুদ্র, নদী, প্রস্রবণ প্রভৃতিকে **স্বাভাবিক জলাশয়** বলে। আমরা পুকুর, বিল, কূপ, ইন্দারা, নলকূপ, আর্টেজীয় কূপ প্রভৃতি খনন করিয়া জল পাই। ইহাদিগকে **কৃত্রিম জলাশয়** বলে।

(খ) **জলের বিশুদ্ধিকরণ** (Purification of water) : স্বাভাবিক বা কৃত্রিম জলাশয়ের জলে ময়লা, মাটি, জীবের দেহাবশেষ, দৃশ্য ও অদৃশ্য জীবাণু, গলিত উদ্ভিদ্ ও জান্তব পদার্থ, খনিজ দ্রব্য, তরল পদার্থ, আবর্জনা, নানারূপ গ্যাস প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। এইরূপ জলকে দূষিত জল বলে। এই সব জলকে নিম্নলিখিত উপায়ে বিশুদ্ধ করিতে হয়।

অদ্রাব্য পদার্থ নিম্নলিখিত উপায়ে পৃথক করা যায় :—

(ক) **থিতান** বা **আস্রাবণ** ( Decantation ) :

**পরীক্ষা** : একটি বড় পাত্রে খানিকটা ঘোলা জল লও। কিছুক্ষণ ইহাকে রাখিয়া দাও, কাদা প্রভৃতি ভারী জিনিষ পাত্রের তলদেশে জমিতে দেখিবে। উপরের জল অনেকটা পরিষ্কার হয়। পাত্রটিকে ধীরে ধীরে কাত করিয়া উপরের পরিষ্কার জলকে অপর পাত্রে ঢালিলে কাদা হইতে জলকে পৃথক করা যায়। এই উপায়ে হাল্‌কা অদ্রাব্য পদার্থ পৃথক করা যায় না। ভারী অদ্রাব্য পদার্থও সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা যায় না।

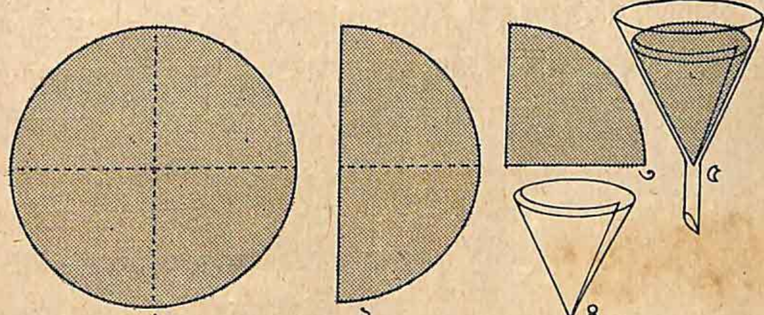


২১নং চিত্র—থিতান

(খ) **পরিস্রাবণ বা ছাঁকন ক্রিয়া** ( Filtration ) : কতকগুলি কাগজের, কাপড়ের বা কয়লার ছিদ্র দিয়া, বা বালির স্তরের মধ্য দিয়া জল অতিক্রম করিলে জলে অদ্রাব্য পদার্থগুলি ছিদ্রের মধ্য দিয়া যাইতে পারে না ; উহারা আট্‌কাইয়া যায় কিন্তু জল চলিয়া যায়। এই নীতির উপর ছাঁকন-ক্রিয়া নির্ভর করে।

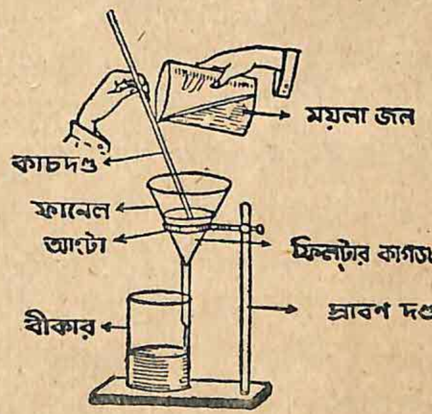
**পরীক্ষা** : একখানি ব্লটিং কাগজ বা ফিল্টার কাগজ ( filter paper ) গোল করিয়া কাট। ইহাকে অর্ধেক করিয়া ভাঁজ কর।

একটি ভাঁজ একদিকে এবং তিন ভাঁজ আর একদিকে রাখ। ইহা এক শঙ্কুর ( cone ) মত হয়। ইহাকে কুপী বা ফানেলের মধ্যে




২২নং চিত্র—ফিল্টার কাগজের ভাঁজ

রাখ। কাগজটিকে দুই-এক ফোঁটা জল দিয়া ভিজাইয়া ফানেলের গায়ে লাগাইয়া দাও। ফানেলকে একটি সরু আংটার উপর রাখ। ফানেলের নীচে একটি পাত্র (বীকার) এমনভাবে রাখ যে উহার সরু অংশ (stem) পাত্রের গা ঘেঁষিয়া থাকে। একটি দণ্ডের সাহায্যে ঘোলা জল ফানেলের মধ্যে ঢাল। কাদা প্রভৃতি অদ্রাব্য পদার্থ ফিল্টার কাগজের উপর আট্‌কাইয়া যায় এবং জল ফিল্টার কাগজের ছিদ্র দিয়া নীচের পাত্রে চলিয়া যায়।




২৩নং চিত্র

এইরূপ উপায়ে জল হইতে অদ্রাব্য পদার্থ পৃথক করা যায় কিন্তু দ্রাব্য পদার্থ পৃথক করা যায় না। জলের সঙ্গে খানিকটা তুঁতে দ্রবীভূত

কর। জলের বর্ণ নীল হয়। এই জল ফিল্টার কাগজে ঢালিলে নীচের জলও নীল হয়।

আমরা সছিদ্র ন্যাক্ড়া বা ছাঁক্‌নি দিয়া চিনির বা মিছরির সরবৎ ছাঁকিয়া থাকি, অদ্রাব্য ময়লাগুলি ন্যাকড়ায় আট্‌কাইয়া যায়। আমরা পানীয় জল পরিষ্কারের জন্য চারি কলসাযুক্ত ফিল্টার ব্যবহার করি। চারিটি কলসী পর পর কাঠের বা বাঁশের ফ্রেমে বসান থাকে। উপরের তিনটি কলসীর তলায় একটি করিয়া ফুটা থাকে। প্রথম কলসীতে অপরিষ্কার ফুটান জল ও একটু ফট্‌কিরি, দ্বিতীয় কলসীতে কয়লা ও তৃতীয় কলসীতে বালি থাকে। জলের ময়লাগুলি কয়লার ও বালির উপর আট্‌কাইয়া যায়। পরিষ্কার জল নীচে চলিয়া আসে। আজকাল বার্কফেল্ড (Barkfeld) ফিল্টার বা পাস্তুর (Pasteur) ফিল্টার ব্যবহৃত হইতেছে। শেষোক্ত ফিল্টারে অমসৃণ (unglazed) চীনামাটির নলের মধ্য দিয়া জল পরিস্রুত হয়।

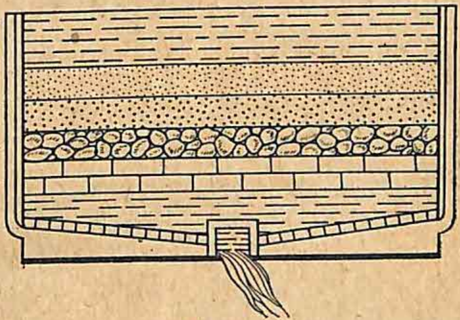


২৪নং চিত্র—কলস ফিল্টার

বড় বড় শহরে নদী, পুকুর বা নলকূপ হইতে পাম্প দিয়া জল তুলিয়া পাকা চৌবাচ্চায় রাখা হয়। জলে কিছু ফট্‌কিরি দেওয়া হয়। ইহাতে কাদা প্রভৃতি ভারী দ্রব্যগুলি শীঘ্রই থিতাইয়া যায়। এই চৌবাচ্চাগুলিকে **থিতান চৌবাচ্চা** (settling tanks) বলে। এইরূপ কয়েকটি চৌবাচ্চায় জল থিতান হয়।

শেষ চৌবাচ্চা হইতে উপরের জলে রৌদ্র ও বায়ু লাগান হয়।

ইহাতে অনেক রোগ-জীবাণু মরিয়া যায়। এই জল পরে কতকগুলি চৌবাচ্চায় লওয়া হয়। এই চৌবাচ্চাগুলিতে পর পর সূক্ষ্ম বালি,




২৫নং চিত্র—শহরে জল ফিল্টার করা

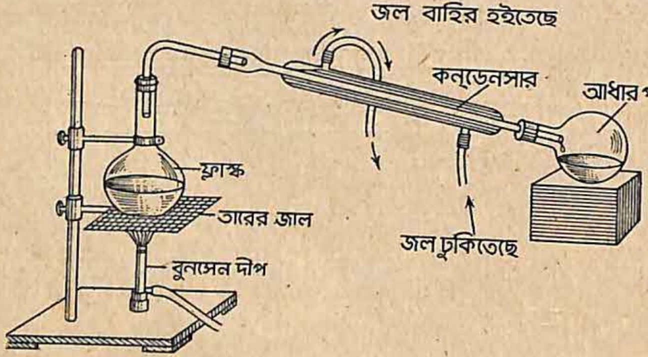
মোটা বালি, নুড়ি ও ইটের স্তরের মধ্য দিয়া জল চলিয়া যায়। নীচের চৌবাচ্চায় পরিস্রুত জল জমে।

(গ) **পাতন** ( Distillation ): আদ্রাবণ ও পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় কেবল জল হইতে অদ্রাব্য পদার্থ পৃথক করা যায়। ইহাতে দ্রব পদার্থ পৃথক করা যায় না। জলে একটু লবণ দ্রবীভূত কর। লবণ জলকে ছাঁক। পরিস্রুত জলও নোন্‌তা লাগে।

লবণ জলকে একটি পাত্রে ফুটাইলে জল বাষ্পীভূত হইয়া যাইবে এবং পাত্রে লবণ পড়িয়া থাকিবে। জলীয় বাষ্পকে কোনও উপায়ে শীতল করিলে আমরা জল ফিরিয়া পাই। এই প্রক্রিয়াকে **পাতন** বলে। অতএব, পাতন = তাপে বাষ্পীভবন + শৈত্যে ঘনীভবন।

**পরীক্ষা**: পাতন-কুপীতে (Distilling flask) খানিকটা জল লও। ইহাতে চিনি, লবণ ও তুঁতে ফেলিয়া দাও। ইহারা জলে দ্রবীভূত হয়। জল নীলবর্ণ হয়। ফ্লাস্কের মুখে একটি কর্কের মধ্য দিয়া একটি থার্মমিটার প্রবেশ করাও যাহাতে ইহার কুণ্ড দ্রবের উপর থাকে। কর্ক দিয়া ফ্লাস্কের নির্গম-নল (Delivery tube) একটি সরু কাচনলের

মুখে লাগাইয়া দাও। এই সরু কাচনলের বাহিরে চারিধারে একটি মোটা কাচনল জোড়া থাকে। দুই নলের মধ্যবর্তী স্থানে শীতল জল ছোট নিম্ন নল দিয়া ঢোকে এবং উচ্চ নিম্ন নল দিয়া বাহির হয়। এইরূপ সরু নলের চারিদিকে শীতল জলস্রোত প্রবাহিত হয়। ঐ দুই




২৬নং চিত্র

নলকে একত্রে **ঘনীকারক যন্ত্র** (Condenser) বলে। ভিতরের সরু নলের শেষ প্রান্ত একটি পাত্রের মধ্যে রাখা হয়। এই পাত্রকে **আধার পাত্র** ( Receiver ) বলে। এখন পাত্রটিকে তারের জালের উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে দীপ দিয়া গরম কর। জলের উষ্ণতা ১০০° ডিগ্রীর কাছাকাছি হইলে বর্ণহীন জলীয় বাষ্প নির্গম নল দিয়া সরু কাচনলে প্রবেশ করে। উহার চারিদিকে শীতল জল থাকায় বাষ্প জমিয়া জল হয়। এই জল আধার পাত্রে পতিত হয়। এই জলের স্বাদ মিষ্ট বা লবণাক্ত হয় না। ইহা বর্ণহীন হয়, সুতরাং চিনি, লবণ বা তুঁতে কোনটাই জলীয় বাষ্পের সঙ্গে আসে না। আধার পাত্রের জলকে **পাতিত জল** বলে। সমুদ্রের লোণা জল এইরূপে বিশুদ্ধ করা হয়। কিন্তু জলে দ্রবীভূত বায়বীয় পদার্থ এইরূপে পৃথক করা যায় না।

(ঘ) **জল-শোধন** ( Sterilisation ) ঃ আস্রাবণ ও পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত জলে অনেক রোগ-জীবাণু থাকিতে পারে। জল রোগ-জীবাণুহীন করাকে জলের **শোধন** বলে। পানীয় জলকে শোধিত করা দরকার।

নিম্নলিখিত উপায়ে জল শোধিত হয়। যথা ঃ—

(১) **ফুটান** ( Boiling ) ঃ অগ্ন্যুত্তাপে পানীয় জলকে ফুটান শোধনের সহজসাধ্য ও নিরাপদ উপায়। জলকে প্রায় অর্ধ ঘণ্টা ফুটাইয়া ছাঁকিয়া একটি পাত্রে ঠাণ্ডা করিয়া পান করা উচিত। পাত্র সব সময়েই ঢাকিয়া রাখিবে।

(২) পাস্তুর ফিল্টারে জল রোগ-জীবাণুমুক্ত হয়।

(৩) রাসায়নিক দ্রব্য—যথা, ব্লিচিং পাউডার, চূণ, পটাশ পারমাঙ্গানেট—জলে দিলে জল রোগ-জীবাণুমুক্ত হয়। চূণ বা পটাশ পারমাঙ্গানেট দিয়া জল দুই-তিন দিন ব্যবহার করা উচিত নয়। ফট্‌কিরিও মৃদু শোধকরূপে কাজ করে।

(৪) অতি-বেগুনি রশ্মি (Ultra-violet rays) জলের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিলে কয়েক সেকেণ্ডেই বহু রোগের জীবাণু মরিয়া যায়।

উপরোক্ত উপায়ে জলকে শোধন করা হয়। জল যাহাতে সহজে দূষিত না হইতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কতকগুলি জলাশয় পানীয় জলের জন্য সংরক্ষিত রাখা কর্তব্য। এই সকল জলাশয়ে কাহাকেও স্নান করিতে, বাসনপত্র ও বস্ত্রাদি ধৌত করিতে দেওয়া উচিত নয়। এই সকল জলাশয়ে যাহাতে গাছের পাতা বা ফল পড়িয়া না পচে, সেইজন্য জলাশয়ের নিকটে কোন বড় গাছ জন্মাইতে দিবে না। কূপের চারিধারে সিমেণ্টের গাঁথুনি করিয়া দিবে যাহাতে দূষিত জল চুয়াইয়া কূপ-জলের সহিত না মিশে। নলকূপের জলই পানের পক্ষে খুব নিরাপদ। ইহার জল গভীর স্তর হইতে আসে।

**(গ) জীবের পক্ষে জলের উপকারিতা ঃ** বায়ুর পরই জল আমাদের অতি উপকারী পদার্থ। বায়ু শ্বাসকার্য ও দহনের জন্য প্রয়োজন হয়, কিন্তু জল আমাদের অনেক কাজে দরকার হয়। জল আমাদের দেহের অভ্যন্তরের যন্ত্রাদি ধৌত করে এবং দেহের দূষিত পদার্থ ঘাম ও প্রস্রাবের সঙ্গে বাহির করিয়া দেয়। জল আমাদের খাদ্য পরিপাক ও শোষণ করিতে সাহায্য করে। আমাদের দেহের নানা প্রকার গ্রন্থির স্রাবের (Secretion of the glands) উপাদান বেশীর ভাগই জল। জল রক্তকে তরল অবস্থায় রাখে এবং সেইজন্য রক্তস্রোত সম্ভব। আমরা এইজন্য জল পান করি। একটা নীতি আছে 'যতটা পার জল পান কর'। অন্য প্রাণীও একই উদ্দেশ্যে জল পান করে।

শরীরের প্রয়োজন ছাড়াও আমরা আবার জলের সাহায্যে রন্ধন করি, বস্ত্রাদি ও বাসনপত্র ধৌত করি, ঔষধপত্র ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করি, চাষের জমিতে জল সেচন করি, জলীয় বাষ্পের দ্বারা ইঞ্জিন চালাই। আরো বহু কাজে আমরা জল ব্যবহার করি।

উদ্ভিদ্ আমাদের মত কঠিন খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে না। কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যতীত উদ্ভিদ্ সমস্ত খাদ্যই জলে দ্রবীভূত অবস্থায় গ্রহণ করে। সুতরাং উদ্ভিদের মাটি হইতে প্রচুর পরিমাণে জল গ্রহণ করিতে হয়। অতিরিক্ত জল পাতার মধ্য দিয়া বাষ্পরূপে বাহির হয়।

২। **মিশ্রণ পদার্থ** ( Mechanical mixture ) ও **যৌগিক পদার্থ** ( Chemical compound ) ঃ দুই বা ততোধিক পদার্থ মিশাইলে নিম্নলিখিত দুই প্রকার ঘটনা ঘটিতে পারে ঃ—

(ক) দুই বা ততোধিক পদার্থ নিজেদের গুণ বা ধর্ম বজায় রাখিয়া যে-কোন ওজনের অনুপাতে মিশিয়া পাশাপাশি থাকিতে পারে। ইহাকে **মিশ্র পদার্থ** বলে।

(খ) দুই বা ততোধিক পদার্থ নির্দিষ্ট ওজনের অনুপাতে যুক্ত হইয়া নিজেদের ধর্ম পরিবর্তিত করিয়া নূতন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থে পরিণত হয়। ইহাকে **যৌগিক পদার্থ** বলে।

অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের মিশ্র পদার্থ বায়ু। আর অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের যৌগিক পদার্থ জল।

## মিশ্র পদার্থ ও যৌগিক পদার্থের পার্থক্য

| | |
|---|---|
| (১) মিশ্র পদার্থে উপাদানের গুণ বজায় থাকে। | (১) যৌগিক পদার্থে উপাদানের গুণ পরিবর্তিত হয় এবং নূতন গুণ-যুক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। |

বায়ুর বেলায় বায়ুর উপাদান অক্সিজেন দহনের সহায়তা করে, ক্ষারীয় প্যাইরোগ্যালেট দ্বারা শোষিত নাইট্রিক অক্সাইডের সঙ্গে বাদামি ধোঁয়া উৎপন্ন করে। জলের বেলায় জলের উপাদান অক্সিজেন দহনের সহায়তা করে না, প্যাইরোগ্যালেট দ্বারা শোষিত হয় না বা নাইট্রিক অক্সাইডের সঙ্গে রং উৎপন্ন করে না। জলের অপর উপাদান হাইড্রোজেনও নিজে জ্বলে না।

| | |
|---|---|
| (২) মিশ্রণের উপাদান সহজে পৃথক্ করা যায়। | (২) যৌগিক পদার্থের উপাদান সহজে পৃথক্ করা যায় না। |

জলকে ফুটাইলে জলে দ্রবীভূত বায়ু বাহির হইয়া আসে কিন্তু এই বায়ুতে অক্সিজেনের ভাগ বেশী থাকে। বায়ুকে খুব শীতল করিলে বায়ু তরল হয়। এই তরল বায়ুকে ফুটাইলে নাইট্রোজেন প্রথমেই বাষ্পীভূত হয়। কিন্তু জলকে ফুটাইলে অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন

পৃথক্ করা যায় না। কোন সাধারণ উপায়ে ইহাদিগকে পৃথক্ করা যায় না।

| | |
|---|---|
| (৩) মিশ্র পদার্থ উৎপাদনের সময় তাপের বা আয়তনের কোন পরিবর্তন হয় না। | (৩) যৌগিক পদার্থ উৎপাদনের সময় হয় তাপ উদ্ভূত হয়, না হয় তাপ শোষিত হয়। কোন কোন সময়ে আয়তনের পরিবর্তন হয়। |

যদি এক ভাগ অক্সিজেন ও চারি ভাগ নাইট্রোজেন মিশ্রিত কর, তবে মিশ্রণটি বায়ুর ধর্ম প্রাপ্ত হয় কিন্তু মিশ্রণের সময় তাপের বা আয়তনের কোন পরিবর্তন হয় না।

যদি দুই ভাগ হাইড্রোজেন এবং এক ভাগ অক্সিজেন মিশ্রিত কর, তবে জল উৎপন্ন হয় না। যদি ঐ মিশ্রণে অগ্নিসংযোগ কর, তবেই জল উৎপন্ন হয়।

| | |
|---|---|
| (৪) মিশ্রণে উপাদানের ওজনের অনুপাত নির্দিষ্ট থাকে না। | (৪) যৌগিক পদার্থে উপাদানের ওজনের অনুপাত একেবারে নির্দিষ্ট। তাহার একটুও এদিক ওদিক হইবার উপায় নাই। |

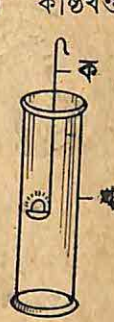
যদিও বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের ওজনের অনুপাত প্রায় এক, তবু বিভিন্ন স্থানের বায়ু বিশ্লেষণ (analysis) করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাদের অনুপাত একটু পরিবর্তিত হয়।

যে-কোন স্থানের জলকে—নদীর জল, সমুদ্রের জল, নলকূপের বা বৃষ্টির জলই হউক বিশুদ্ধ করিয়া বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের ওজনের অনুপাত একবারে নির্দিষ্ট।

(খ) **বায়ুর ও জলের উপাদানের কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম** (Some important properties of the elements of air and water) :—বায়ুর উপাদান অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলের উপাদান অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন। আমরা এই কয়টি উপাদানের বিশিষ্ট ধর্মের কথা আলোচনা করিব।

(i) **অক্সিজেনের ধর্ম** : (১) অক্সিজেন বর্ণহীন, শব্দহীন, গন্ধহীন গ্যাস ; (২) ইহা জলে সামান্য দ্রাব্য ; (৩) ইহা দহনের সহায়ক, কিন্তু নিজে অদাহ্য। দ্রবীভূত অক্সিজেন দ্বারা জলজ জীব শ্বাসকার্য চালায়।

**পরীক্ষা** : একখণ্ড মৃদু আভাযুক্ত (glowing) কাষ্ঠখণ্ড অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাস-জারে প্রবেশ করাও। কাষ্ঠখণ্ড উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতে থাকে কিন্তু অক্সিজেন নিজে জ্বলে না।




২৭নং চিত্র

(৪) ইহা খুব সক্রিয় পদার্থ। ইহা বহু পদার্থে যুক্ত হয়।

**পরীক্ষা** : উজ্জ্বলন চামচে করিয়া পর পর মৃদু প্রজ্বলিত গন্ধক, সোডিয়াম, ফস্‌ফরাস্‌, রক্ততপ্ত (redhot) লৌহ লইয়া অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাস-জারে প্রবেশ করাও। প্রত্যেক ক্ষেত্রে উহারা উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতে থাকে। লৌহ হইতে ফুলঝুরি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঐ সকল দ্রব্য অক্সিজেনের সঙ্গে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে।

(ii) **নাইট্রোজেনের ধর্ম** : (১) নাইট্রোজেন বর্ণহীন, স্বাদহীন ও গন্ধহীন গ্যাস ; (২) ইহা জলে অতি সামান্য দ্রাব্য ; (৩) ইহা দাহ্য নয় এবং দহনের সহায়ক নয়। জ্বলন্ত বাতি নাইট্রোজেনপূর্ণ গ্যাস-জারে ঢুকাইলে বাতি নিভিয়া যায় এবং গ্যাসও জ্বলে না। ইহা চূণের জলকে ঘোলাটে করে না।

(iii) **হাইড্রোজেনের ধর্ম ঃ** (১) হাইড্রোজেন বর্ণহীন, স্বাদহীন ও গন্ধহীন গ্যাস। (২) **ইহা বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা।**

**পরীক্ষা ঃ** (ক) একটি রবার-বেলুন বা সাবানের বুদ্‌বুদ্‌ হাইড্রোজেন ভর্তি করিয়া বাতাসে ছাড়িয়া দিলে হাল্‌কা বলিয়া আপনা আপনি উপরে উঠিয়া যায়।

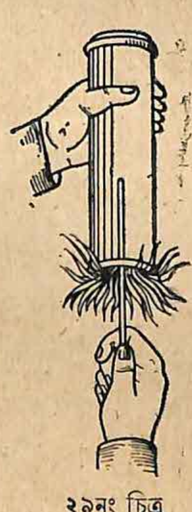


২৮নং চিত্র

(খ) বায়ুপূর্ণ উল্টা গ্যাস-জারের নীচের মুখে হাইড্রোজেনপূর্ণ গ্যাস-জার ধরিলে হাইড্রোজেন হাল্‌কা বলিয়া উপরের জারের বায়ুকে সরাইয়া উহার স্থান অধিকার করে। ইহাকে **'হাইড্রোজেন ঢালা'** বলে। উপরের জারের মুখে আগুন ধরিলে উহা জ্বলিবে।

(৩) **হাইড্রোজেন দাহ্য গ্যাস কিন্তু দহনের সহায়ক নহে।**

**পরীক্ষা ঃ** হাইড্রোজেন গ্যাস-জার উল্টা করিয়া একটি জ্বলন্ত বাতি উহার ভিতর প্রবেশ করাও। গ্যাস-জারের মুখে গ্যাস জ্বলিতে থাকে কিন্তু ভিতরে বাতি নিভিয়া যায়। হাইড্রোজেনের শিখার বর্ণ ফিকে নীল।


২৯নং চিত্র

(৪) **হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ বিস্ফোরক ঃ** সোডা ওয়াটারের বোতল প্রথমে জলপূর্ণ কর। তারপর জল সরাইয়া বোতলের $\frac{2}{3}$ ভাগ হাইড্রোজেন ও $\frac{1}{3}$ ভাগ অক্সিজে[illegible] পূর্ণ কর। বোতলটিকে তোয়ালে

দিয়া জড়াইয়া ধর। বোতলের মুখ জ্বলন্ত বাতির নিকট ধর। ইহাতে ভীষণ বিস্ফোরণ হয় এবং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন যুক্ত হইয়া জল উৎপন্ন করে।

**(৫) হাইড্রোজেন জ্বলিলে জল উৎপন্ন হয়।**

**পরীক্ষা** ঃ একটি নলের মুখে শুষ্ক হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বাল। হাইড্রোজেনের শিখার উপর একটি পাত্রে বরফ রাখ। হাইড্রোজেনের ও অক্সিজেনের মিলনে যে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা শীতল পাত্রের গায়ে জমিয়া জলবিন্দুরূপে জমিতে থাকে।

(৬) হাইড্রোজেন চূণের জলকে ঘোলা করে না।

(৭) হাইড্রোজেনকে একটি নলের মুখে জ্বাল। পরে অপর একটি নল দিয়া শিখাতে অক্সিজেন সরবরাহ কর। এইরূপ শিখা এত উষ্ণ হয় যে ইহাতে লোহা গলিয়া যায়।

(iv) **কার্বন ডাই-অক্সাইডের ধর্ম** ঃ (১) ইহা বর্ণহীন, স্বাদযুক্ত ও একটু গন্ধহীন গ্যাস।

**(২) ইহা বায়ু অপেক্ষা খুব ভারী।**

**পরীক্ষা** ঃ (ক) কার্বন ডাই-অক্সাইডপূর্ণ গ্যাস-জারে বায়ুপূর্ণ সাবানের বুদ্‌বুদ্‌ ছাড়িয়া দিলে উহা কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপর ভাসিতে থাকে।



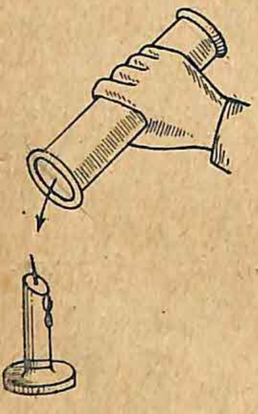

৩০নং চিত্র

(খ) একটি কার্বন ডাই-অক্সাইডপূর্ণ গ্যাস-জারকে উল্টাইয়া বায়ুপূর্ণ গ্যাস-জারের উপর রাখ। কার্বন ডাই-অক্সাইড ভারী বলিয়া ইহা বায়ুকে তাড়াইয়া নীচের জারে চলিয়া যায়। নীচের জারে পরিষ্কার চূণের জল লইলে ইহা ঘোলাটে হয়।

(৩) **ইহা জলে দ্রাব্য।** সোডা ওয়াটার, লেমোনেড প্রভৃতিতে অধিক চাপে কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত থাকে। বোতল খুলিলে চাপ কমিয়া যায় ও দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড বুদ্‌বুদের আকারে বাহির হয়।

(৪) **ইহা দাহ্যও নহে এবং দহনের সহায়কও নহে।**

**পরীক্ষা ঃ** (ক) একটি কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসপূর্ণ গ্যাস-জার একটি জ্বলন্ত বাতির উপর উপুড় করিলে গ্যাস জ্বলে না এবং বাতি নিভিয়া যায়।



৩১নং চিত্র

(খ) কেরোসিন-সিক্ত ন্যাকড়ায় আগুন দাও। আগুনের উপর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ঢাল। আগুন নিভিয়া যায়। এই অগ্নি-নির্বাপক গুণের জন্য ইহা অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

(গ) ইহা পরিষ্কার চূণের জল ঘোলাটে করে। ইহার অনেক পরীক্ষা পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

৩। **জলের দ্রাবক শক্তি** ( Solvant action of water ) ঃ জল একটি উত্তম দ্রাবক। ইহা কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ দ্রবীভূত করে। বৃষ্টির জলে অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সাল্‌ফার ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি গ্যাস দ্রবীভূত হয়। ভূপৃষ্ঠের ও ভূগর্ভের নানা লবণজাতীয় দ্রব্য ঝরণার ও নদীর জলে দ্রবীভূত হয়। যে জলে কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত থাকে, সেই জলের দ্রাবক শক্তি বাড়িয়া যায়। জলের দ্রাবক শক্তির জন্য ইহা

রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত হয়। জলের দ্রাবকশক্তির জন্য জলকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না।

৪। (ক) **আর্দ্রতা** ( Humidity ) ঃ সূর্যতাপে সাগর, নদী, পুকুর প্রভৃতি জলাশয় হইতে সর্বদাই জল বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুতে মিশিতেছে। প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ হইতে জলীয় বায়ু বাহির হইয়া বায়ুতে মিশে। জলীয় বাষ্প গ্যাসের ন্যায় অদৃশ্য।

তোমাদের সাম্‌নে প্রচুর খাবার থাকিলেও তোমাদের খাবার একটি সীমা থাকে। কোন নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকিতে পারে। এইরূপ অবস্থার বায়ুকে **পূর্ণ-সিক্ত** বায়ু বলে। পূর্ণ-সিক্ত বায়ু শীতল হইলে অতিরিক্ত বায়ু জমিয়া জল হয়।

বায়ুতে নানা কারণে জলীয় বাষ্পের পরিমাণের তারতম্য হয়। যথা **উষ্ণতা** ঃ (১) উষ্ণতা বাড়িলে বায়ুর বাষ্প ধারণ করিবার শক্তি বাড়িয়া যায়, সুতরাং বায়ুতে বাষ্পের পরিমাণ বাড়ে। আর্দ্র বস্ত্র প্রখর রৌদ্রে শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া যায় অর্থাৎ কাপড়ের জল বাষ্পীভূত হয়। প্রাতে বা সন্ধ্যায় সূর্যের তেজ কম থাকে বলিয়া কাপড় দেরীতে শুকায়। শীতকালে ঠাণ্ডা দিন অপেক্ষা গ্রীষ্মের উষ্ণ দিনে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী থাকে, তথাপি গ্রীষ্মের দিনে আমরা শুষ্ক বোধ করি। কারণ গ্রীষ্মে বায়ুর পূর্ণ-সিক্ত অবস্থা হইতে অনেক কম বাষ্প থাকে।

(২) বায়ু যত শুষ্ক হয়, জল তত বেশী বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুতে মিশে। বর্ষাকালে বায়ু প্রায় পূর্ণ-সিক্ত থাকে, সেইজন্য বস্ত্র শুকাইতে দেরী হয়। গ্রীষ্মে কোন আর্দ্র দিনে বায়ুতে যথেষ্ট জলীয় বাষ্প থাকে বলিয়া আমাদের চামড়া হইতে বাষ্পীভবন কম হয়। সেইজন্য আমরা অস্বস্তি বোধ করি। শীতকালে বায়ু প্রায় শুষ্ক থাকে বলিয়া সিক্ত বস্ত্র শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া যায়।

(৩) বায়ু প্রবাহিত হইলে জল শীঘ্র শীঘ্র বাষ্পীভূত হয়। বায়ু-প্রবাহ পূর্ণ-সিক্ত বায়ুকে অপসারিত করে। সেই স্থানে অসিক্ত বায়ু আসে। ইহাও শীঘ্র শীঘ্র জলীয় বাষ্পসিক্ত হয়।

**বায়ুর আর্দ্রতা ও শুষ্কতা :** উপরোক্ত আলোচনা হইতে তোমরা বুঝিতেছ যে, আমাদের বায়ুর শুষ্কতা ও আর্দ্রতার অনুভূতি বায়ুতে মোট বাষ্পের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। কোন নির্দিষ্ট বায়ুতে প্রকৃত বাষ্পের পরিমাণ ও পূর্ণ-সিক্ত বাষ্পের পরিমাণের অনুপাতের উপর নির্ভর করে। ইহাকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশী হইলে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। আর্দ্র আবহাওয়া কতকগুলি শিল্পের অনুকূল। কতকগুলি রোগ-জীবাণু আর্দ্র আবহাওয়ায় বংশবৃদ্ধি করে। নিরাপদে বিমান চালনার জন্য বায়ুর আর্দ্রতা জানা দরকার। আবহাওয়া অফিস হইতে প্রত্যহ ঘণ্টায় ঘণ্টায় বায়ুর আর্দ্রতা জানা হয়।

(খ) **বৃষ্টি, মেঘ, কুয়াসা, শিশির ও তুষার** ( Rain, cloud, fog, dew and snow ) :—বৃষ্টি, মেঘ, কুয়াসা, শিশির ও তুষার —ইহারা সকলেই অবস্থা-বিশেষে বায়ুর জলীয় বাষ্প হইতে উষ্ণতা হ্রাসের জন্য উৎপন্ন হয়।

**মেঘ ও বৃষ্টি :** বায়ু উষ্ণ হইলে হাল্‌কা হয়। বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশী থাকিলে উহা সাধারণ বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা হয়। সুতরাং উষ্ণ জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু হাল্‌কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। নীচের বায়ু অপেক্ষা উপরের বায়ু বেশী শীতল হয়। উপরের বায়ুর চাপ কম হয় ; সেইজন্য নীচের বায়ু উপরে উঠিয়া প্রসারিত হয়। বায়ু প্রসারিত হইলে শীতল হয়, সুতরাং নীচের বাষ্পপূর্ণ বায়ু উপরে উঠিয়া শীতলতর বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া ও প্রসারিত হইয়া অধিক শীতল হয় এবং অতি ক্ষুদ্র হাল্‌কা জলকণায় পরিণত হয়। ইহারা বায়ুর

ধূলিকণা আশ্রয় করিয়া বায়ুমণ্ডলে ভাসিতে থাকে। ইহাকে **মেঘ** বলে। বায়ুবেগে ইতস্তত সঞ্চরণশীল মেঘ শীতল পর্বতগাত্রের বা শীতলতর বায়ুর সংস্পর্শে আসিলে অনেক জলকণা একত্র হইয়া ভারী হয়। ইহারা তখন বায়ুতে ভাসিতে পারে না, বৃষ্টির আকারে নীচে পতিত হয়। অনেক সময় বৃষ্টি মাটিতে পড়িবার পূর্বে ঊর্ধ্বগামী উষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শে আবার বাষ্পীভূত হইয়া উপরে উঠিয়া যায়।

**কুয়াসা** ঃ কখন কখন শীতকালে রাত্রিতে ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ করিয়া এত শীতল হয় যে, ভূপৃষ্ঠের উপরের বায়ুর জলীয় বাষ্প বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণা বা কয়লার কণায় জমিয়া বায়ুতে ভাসিয়া বেড়ায়। ইহাকে আমরা কুয়াসা বলি। বড় বড় শহরের বায়ুতে কারখানার কয়লার গুঁড়া ও ধোঁয়া বেশী থাকে বলিয়া এইখানে কুয়াসা বেশী হয়। জলীয় বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসিলে কুয়াসা হয়। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট এইরূপ আর্দ্র শীতল ও উষ্ণ বায়ু মিশিয়া ভীষণ কুয়াসা সৃষ্টি করে।

অধিকতর ঘন কুয়াসাকে fog বলে। ভূপৃষ্ঠের উপরে ভাসমান জলকণাকে **কুয়াসা**, বহু ঊর্ধ্বে ভাসমান জলকণাকে **মেঘ** বলে।

**শিশির** ঃ শরৎকালে ভোরের বেলায় গাছের পাতায় ও ঘাসের উপর শিশিরবিন্দু মুক্তার মত ঝক্‌মক্ করে। সূর্যাস্তের পর সকল দ্রব্য তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হইয়া পড়ে। ঐ সকল দ্রব্যের সংস্পর্শে বায়ুও শীতল হয় এবং শীতল বায়ু অধিক জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে না। উদ্বৃত্ত জলীয় বাষ্প ঐ সকল দ্রব্যের উপরে জলবিন্দুরূপে জমে। ইহাকে **শিশির** বলে। যে সমস্ত দ্রব্য—যথা ঘাস্, পাথর, পাতা—বেশী তাপ বিকিরণ করে, তাহাদের উপর বেশী পরিমাণ শিশির জমে। শিশির বৃষ্টির ন্যায় আকাশ হইতে পড়ে না। একখানি থালা কোন উন্মুক্ত স্থানে রাখিলে উহার নীচের দিকে শিশির জমে। বায়ু

প্রবাহিত হইলে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে শিশির কম উৎপন্ন হয়, মেঘ তাপ বিকিরণে বাধা দেয়।

**তুষার**ঃ পর্বতের উচ্চ স্থানে অধিক শৈত্যের জন্য মেঘের মধ্যস্থিত বাষ্প জমিয়া কঠিন হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। ইহাকে **তুষার** বলে।

**প্রকৃতিতে জলচক্র** ( Water cycle in nature ) ঃ মহাসাগর, সাগর,নদনদী হইতে অনবরত জল বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুতে মিশিতেছে। জলীয় বাষ্প হাল্‌কা বলিয়া এই বায়ু উপরে উঠিয়া যায়। এই রকম বায়ু যদি উপর দিকে উঠিতেই থাকে, তবে কয়েক শত বৎসরে পৃথিবীর মহাসাগর, সাগর সব শুকাইয়া যাইবে। পৃথিবীর কোথাও এক ফোঁটা জল থাকিবে না। কিন্তু তাহা হয় না। বায়ুর জলীয় বাষ্প জমিয়া মেঘ হয়। মেঘ জমিয়া বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির জল হইতে নদী, ঝরণা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। নদীর জল আবার সাগরে পড়ে। এই রকম জলচক্র চলিতে থাকে। জলীয় বাষ্পের কতকাংশ পর্বতে জমিয়া থাকে। তাহা গলিয়া জল হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদ্ যে জল পান করে, তাহার খানিকটা ঘামরূপে বাহির হয়।

৫। **খর** ( Hard ) ও **মৃদু** ( Soft ) **জল**ঃ যে জলে সাধারণ সাবান ঘষিলে সহজে ফেনা হয় তাহাকে **মৃদু জল** বলে। যে জলে সাধারণ সাবান ঘষিলে সহজে ফেনা হয় না, তাহাকে **খর জল** বলে।

**খরতার কারণ**ঃ স্বাভাবিক জলে কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। ক্যাল্‌সিয়াম কার্বনেট, ম্যাগ্‌নেসিয়াম কার্বনেট বিশুদ্ধ জলে দ্রবীভূত হয় না কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত জলে ইহারা দ্রবীভূত হইয়া যথাক্রমে ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম বাইকার্বনেটে পরিণত হয়। ইহা ছাড়া ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম ধাতুর ক্লোরাইড ও সাল্‌ফেট দ্রবীভূত থাকে। যে জলে উপরোক্ত চারিটি পদার্থ থাকে

তাহাকে খর জল বলে। জলের এই সব দ্রাব্য পদার্থ সাবানের সহিত যুক্ত হইয়া কতকগুলি অদ্রাব্য পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহাতে সাবান অযথা নষ্ট হয়।

**জলের মৃদুকরণ** (Methods of softening water) : জলের খরতা দূর করিলে জল মৃদু হয়। জলের এই সকল দ্রাব্য পদার্থগুলিকে অদ্রাব্য পদার্থে পরিণত করিয়া সহজে পৃথক্ করিলে জলের **খরতা** দূর হয় :—

(১) জলকে ফুটাইলে জলের দ্রাব্য বাইকার্বনেট অদ্রাব্য কার্বনেটে পরিণত হয়। এই জলকে ছাঁকিয়া লইতে হয়। এই জলে সাবান ঘষিলে সহজে ফেনা হয়। এইরূপ সহজে যে খরতা দূর হয়, তাহাকে **অস্থায়ী খরতা** বলে।

(২) অস্থায়ী খর জলে চূণের জল মিশাইলে উপরোক্ত দ্রাব্য পদার্থ অদ্রাব্য পদার্থে পরিণত হয়। উহাদিগকে ছাঁকিয়া লইতে হয়।

(৩) যখন খর জলে দ্রাব্য ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম ক্লোরাইড বা সাল্‌ফেট থাকে, তখন জলের সহিত কিছু সোডিয়াম কার্বনেট (কাপড় কাচা সোডা) মিশাইয়া গরম করিতে হয়। ইহাতে দ্রাব্য পদার্থ অদ্রাব্য পদার্থে পরিণত হয়। এই জল ছাঁকিলে মৃদু জল পাওয়া যায়। এই খরতাকে **স্থায়ী খরতা** বলে।

(৪) জলের পাতন দ্বারা কিংবা কস্টিক সোডা ও সোডিয়াম কার্বনেটের মিশ্রণ দ্বারা দুই প্রকার খরতা দূর হয়।

(৫) পারমুটিট নামক দ্রব্যের মধ্য দিয়া জল পরিস্রুত করিলে দ্রাব্য ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণ অদ্রাব্য লবণে পরিণত হয়। ইহার ক্রিয়া পরে জানিতে পারিবে।

ধোপাখানায়, বয়লারে, রাসায়নিক শিল্পে মৃদু জল ব্যবহার করা উচিত।

## জল ও বাঁধ

৬। **জলশক্তি-চালিত কল** (Wind mill) ঃ প্রবহমান বায়ু দ্বারা যেমন কল চালান যায়, তেমন জলের প্রবল গতির দ্বারা কল চালান হয়। একটি কেন্দ্রীয় দণ্ডের চারিদিকে কতকগুলি বড় পাখা (Turbine) যুক্ত থাকে। উচ্চ হইতে প্রবলবেগে পতিত জলের গতির মুখে ঐ পাখা রাখা হয়। জলের প্রবল গতিতে পাখাগুলি চক্রাকারে প্রবল বেগে ঘুরিতে থাকে। এই ঘূর্ণন গতি দ্বারা সাক্ষাৎভাবে কল চালান যায় কিংবা পরোক্ষভাবে ডা য়-না মো চালাইয়া তড়িৎ উৎপাদন করা যায়। এই তড়িৎ দিয়া আলো জ্বালান যায়, কলকারখানা চালান যায়।



৩২নং চিত্র

অনেক সময় খুব উচ্চে বাঁধ (Dam) নির্মাণ করিয়া বাঁধে জল সঞ্চয় করা হয়। এই জলকে কৃত্রিম উপায়ে নীচে প্রবল বেগে পড়িতে দেওয়া হয়। জলের এই গতি-শক্তির দ্বারা ডায়নামো চালাইয়া তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন করা হয়। দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন এরূপভাবে তড়িৎ উৎপন্ন করিতেছে।

## তৃতীয় অধ্যায়

## শক্তি ( Energy )

১। (ক) **শক্তির উৎস** : কোন পদার্থের কাজ করিবার ক্ষমতাকে বা সামর্থ্যকে **শক্তি** বলে। আমাদের শক্তি আছে বলিয়া আমরা কাজ করি। যে মানুষ দুর্বল তাহার শক্তি কম, সে কাজও করে কম। প্রবহমান বায়ুর শক্তি আছে বলিয়াই তাহা কলকারখানা চালায়।

শক্তি প্রধানত দুই প্রকার। যথা :—

(১) **গতিশক্তি** ( Kinetic energy ) : যে-কোন পদার্থ যখন গতিসম্পন্ন হয়, তখন গতির জন্যই তাহার কাজ করিবার ক্ষমতা জন্মায়। এই ক্ষমতাকে গতিশক্তি বলে। একটি ঢিল হাতে থাকিলে উহার কোন শক্তি থাকে না কিন্তু ঢিলটি জোরে জানালার কাচে ছুঁড়িলে জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া যায়। গতির জন্যই ঢিলটিতে শক্তি জন্মিল। উচ্চ স্থান হইতে পতিত জল এত গতিসম্পন্ন হয় যে, ঐ জলের দ্বারা কলকারখানা চলে। প্রবহমান বায়ুর সাহায্যে পালের নৌকা চলে, কলকারখানা চলে, ঘরবাড়ী, বৃক্ষ উৎপাটিত হয়। মাটির উপর নিশ্চল কামানের গোলার কোন শক্তি নাই কিন্তু বিস্ফোরকের সাহায্যে উহাকে গতিশীল করা হইলে উহা প্রলয়কারী শক্তি অর্জন করে। প্রত্যেক গতিশীল পদার্থ কিছু না কিছু কাজ করে।

(২) **স্থৈতিক শক্তি** ( Potential energy ) : পদার্থ কেবল গতিশীল হইলেই যে শক্তিসম্পন্ন হয় তাহা নহে। পদার্থের বিশেষ অবস্থানের ( Position ) জন্য উহার ভিতর কার্য করিবার শক্তি জন্মায়। ইট যখন ছাদের উপর থাকে, তখন ইহার স্থৈতিক শক্তি থাকে। ইট তোমার মাথায় পড়িলে তোমার মাথা ফাটিয়া যাইবে।

একখণ্ড রবারকে লম্বা করিলে বা চাবি দিবার সময় ঘড়ির স্প্রীংকে গুটাইলে, উহাদের উপর আমরা কাজ করি। সেইজন্য উহাদের ভিতর শক্তি সঞ্চারিত হয়। রবার, স্প্রীংকে ছাড়িয়া দিলে উহারা কাজ করে। পৃথিবীর যাবতীয় শক্তি হয় স্থৈতিক, না হয় গতীয় শক্তি, না হয় ইহাদের সমবায়।

আমরা নিম্নলিখিত শক্তি পাইয়া থাকি ঃ—

(১) **তাপশক্তি ঃ** জল গরম করিলে বাষ্প হয়। ইহাতে অণুর গতি বাড়িয়া যায়। বাষ্পের চাপে ইঞ্জিনের চাকা ঘুরে। তাপশক্তিই কাজ করে। তাপ অণুর গতিশক্তি। তাপশক্তির উৎসের কথা পরে বলা হইবে।

(২) **আলোকশক্তি ঃ** আলোকশক্তি আমাদের চোখের পর্দায় আঘাত করে অর্থাৎ কাজ করে। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই। সূর্যের আলো গাছের পাতাকে সবুজ করে, ফটোগ্রাফির কাচকে কালো করে। গ্যাস, বাতি, কয়লা পোড়াইলে আলোকশক্তি বাহির হয়। ইলেক্‌ট্রিক বাতি হইতে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা তড়িৎ-শক্তির রূপান্তরিত তাপশক্তি হইতে সৃষ্ট হয়। আলোক তরঙ্গের গতিশক্তি।

দুইটি পাথরে ঘর্ষণ করিলে তাপ ও আলো পাওয়া যায়।

(৩) **শব্দশক্তি ঃ** শব্দশক্তি কানের পাতলা চামড়াকে কাঁপায় অর্থাৎ কাজ করে। ইহাতে আমরা শুনিতে পাই। নিকটে মেঘগর্জন হইলে শব্দশক্তিতে কাচের জানালা ঝন্‌ঝন্‌ করে। সেতারের তার আঙ্গুল দিয়া টানিলে তার কাঁপিতে থাকে। ইহাতে নানাপ্রকার ঝঙ্কার উত্থিত হয়।

(৪) **চুম্বকশক্তি ঃ** চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করে। কৃত্রিম ও স্বাভাবিক চুম্বক দুই রকম চৌম্বক শক্তির আধার।

(৫) **তড়িৎ-শক্তি** :—তড়িৎ-শক্তি আলো দেয় এবং পাখা, ট্রাম-গাড়ি, রেলগাড়ি ও কলকারখানা চালায়। ব্যাটারি, সেল, ডায়নামো হইতে তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যায়।

(৬) **রাসায়নিক শক্তি** : দেশালাইএর কাঠির মাথার মশলা রাসায়নিক শক্তির জন্য জ্বলিয়া উঠে।

(৭) **আহার** : আমরা যে আহার গ্রহণ করি তাহার কার্বন ও হাইড্রোজেন বায়ুর অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া করে। এই রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়। এই শক্তি দিয়া আমরা কাজ করি। আমরা যখন একখানি ইট ছাদে তুলি তখন আমরা দৈহিক শক্তি দিয়া পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে ইটের উপর কার্য করি। আমরা চলাফেরা করিলে আমাদের দৈহিক শক্তি গতিশক্তিতে পরিণত হয়। শরীরের তাপশক্তি হইতে দৈহিক শক্তি উৎপন্ন হয়। আবার দৈহিক শক্তি হইতে জিহ্বার গতিশক্তি উৎপন্ন হয়। আবার জিহ্বার গতিশক্তি হইতে শব্দশক্তি উৎপন্ন হয়।

(৮ **সৌর-শক্তি পার্থিব সকল শক্তির মূল** : পৃথিবীতে কয়লা, কাঠ, তৈল, বায়ুপ্রবাহ, জলপ্রবাহ, তড়িৎ প্রভৃতি শক্তির প্রধান আধার; কিন্তু এই সকল দ্রব্য হইতে উদ্ভূত সমস্ত শক্তি পরোক্ষভাবে সৌর শক্তি হইতে আসে। সূর্যের আলো ও তাপের সাহায্যে উদ্ভিদ্ কার্বন ডাই-অক্সাইড বিশ্লেষণ করিয়া আহার আত্মসাৎ করে। এইরূপে সৌর শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়। উদ্ভিদ্ মাটির নীচে চাপা পড়িয়া ভীষণ চাপে কয়লায় পরিণত হয়। কয়লা ও কাঠ জ্বালাইয়া তাপ শক্তি পাই। তাপ জলকে বাষ্প করে। বাষ্পের চাপে আমরা ইঞ্জিন, কলকারখানা চালাই, ডায়নামো চালাই, তড়িৎ উৎপন্ন করি, তড়িৎ দ্বারা কলকারখানা চালাই। সূর্যতাপে জল বাষ্পীভূত হইয়া উপরে উঠে। জলে সৌর শক্তি থাকে, জল বৃষ্টিরূপে নামে। জলের গতীয়

শক্তি থাকে। এই শক্তি হইতে জলশক্তি পাওয়া যায়। আবার খাদ্য হইতে যে দৈহিক শক্তি ও তাপ পাই তাহাও পরোক্ষভাবে সৌর শক্তি হইতেই পাই। সূর্য হইতে সাক্ষাৎভাবেও প্রচুর আলো ও তাপ পাই।

(খ) **দেহ, ঘড়ি ও ইঞ্জিনের তুলনা** :—ঘড়ি ও ইঞ্জিন জটিল যন্ত্রবিশেষ। ইহাদের ভিতরে অনেক কলকব্জা আছে। প্রত্যেক কলকব্জার বিশিষ্ট কাজ আছে। ঘড়ি ও ইঞ্জিন হইতে সামান্য একটি স্ক্রু খুলিয়া লইলে ঘড়ি ও ইঞ্জিন বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের দেহ ইহাদের মত জটিল যন্ত্র। দেহের মধ্যেও অনেক কলকব্জা আছে। একটি কলকব্জা বিকল হইলে দেহের কার্য ব্যাহত হয়। সমস্ত কলকব্জা সামঞ্জস্য রাখিয়া কাজ করে।

ইঞ্জিনে কয়লা পুড়াইয়া উহা চালাইবার শক্তি সরবরাহ হয়। ঘড়িতে স্প্রীংএ দম দিয়া উহা চালাইবার শক্তি সংগ্রহ হয়। আমাদের দেহেও খাদ্য পুড়িয়া দেহে শক্তি উৎপন্ন হয়। ইঞ্জিন ও ঘড়ি মাঝে মাঝে মেরামত করিতে হয়। আমাদের দেহও মাঝে মাঝে মেরামত করিতে হয়। তবে ঘড়ির ইঞ্জিনের কোন অংশ খারাপ হইলে সেই অংশ বদলাইয়া মেরামত করিতে হয় কিন্তু আমাদের দেহ খাদ্য হইতে এই ক্ষয়িত অংশ গঠন করে; অর্থাৎ খাদ্য দুইটি কাজ করে—একটি শক্তি সরবরাহ, অপরটি দেহের ক্ষয়িত অংশ মেরামত ও দেহগঠন। ইঞ্জিন বা ঘড়ি আপনা হইতে দেহ গঠন করিতে পারে না।

২। **তাপ ও তাপের উৎস** ( Heat and its sources ) : বরফ হাতে ঠাণ্ডা লাগে। আগুন হাতে গরম লাগে। ঠাণ্ডা-গরমের অনুভূতি হইল তাপ। কয়লা জ্বালিলে আগুন পাই। কয়লার রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তিতে পরিণত হয়। এই তাপে

জল বাষ্প হয়, বাষ্পের চাপে গাড়ি চলে, অতএব তাপ একটি শক্তি। আমরা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উৎস হইতে তাপ পাই :—

(i) সূর্য ( Sun ) : সূর্য তাপের একটি বিরাট আধার। ইহা একটি বিশাল জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড। একটি জ্বলন্ত বাতির শিখা কতটুকু! সূর্যের এক একটি শিখা লক্ষ লক্ষ মাইল বিস্তৃত। সূর্যের উপরিভাগের উষ্ণতা প্রায় ৬০০০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড আবার কেন্দ্রের উষ্ণতা প্রায় চার কোটি ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। আমরা প্রত্যক্ষভাবে সূর্যের মোট তাপের অতি অল্পই পাই। এই তাপে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কি অসহ্য গরম বোধ করি। সূর্যের তাপই পরোক্ষভাবে আমাদের সকল শক্তির উৎস। খাদ্যশস্য, কয়লা, বায়ুপ্রবাহ, জলপ্রবাহ, তৈল প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত শক্তি পরোক্ষভাবে সূর্যের তাপের উপর নির্ভর করে।

(ii) **বিদ্যুৎ** ( Electricity ) : সূক্ষ্ম ধাতব তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে খুব তাপ উদ্ভূত হয়। এই উপায়ে তড়িৎ তাপযন্ত্র ( heater ), তড়িৎ উনান, তড়িৎ দীপ (arc), তড়িৎ ফারনেস প্রস্তুত হয়।

(iii) **যান্ত্রিক ক্রিয়া** ( Mechanical action ) : দুইটি কঠিন পদার্থে ঘর্ষণ করিলে তাপ উৎপন্ন হয়। দুই হাতের তালু ঘর্ষণ করিলে তালু গরম হইয়া উঠে। পাথরের সহিত লোহা ঠুকিলে আগুন বাহির হয়।

(iv) **রাসায়নিক ক্রিয়া** (Chemical action) : হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনের সময় প্রভূত তাপ উদ্ভূত হয়। যখন পাথুরে চূণ জলে ভিজান যায় তখন এত তাপ উদ্ভূত হয় যে জল ফুটিতে থাকে। বাতির দহনে ও কয়লার দহনে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তাপ উদ্ভূত হয়।

৩। **তাপের ফল** ( Effect of heat ) : কোন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া যায় :—

(ক) **উষ্ণতা-বৃদ্ধি, ভাস্বরতা** (incandescence) **ও দহন** : তাপ প্রয়োগ করিলে প্রত্যেক পদার্থের উষ্ণতা ( temperature ) বাড়ে। তোমরা পূর্বে জানিয়াছ যে, কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় তাপ ও আলো উদ্ভূত হইলে তাহাকে দহন বলে। সুতরাং দহনে কোন পদার্থের উষ্ণতা বাড়ে। যদি কোন পদার্থকে এত উত্তপ্ত করা যায় যে উহা আলো দেয়, তবে তাহাকে **ভাস্বর** ( incandescent ) বলে। এই ঘটনাকে **ভাস্বরতা** বলে। প্ল্যাটিনাম তার, গ্যাস ম্যাণ্টল, তড়িৎ বালবের তন্তু ( filament ) উত্তপ্ত হইলে আলো দেয়। ইহারা ভাস্বরতার দৃষ্টান্ত কিন্তু দহনের দৃষ্টান্ত **নহে** ; কারণ এখানে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না। কয়লা বা ম্যাগ্‌নেসিয়াম পোড়ান দুয়েরই দৃষ্টান্ত।

প্রত্যেক দাহ্য বস্তুকে এমন একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় উত্তপ্ত করিতে হয় যে উহা বায়ুতে জ্বলিতে পারে। ইহাকে জ্বলনাঙ্ক বলে। সেইজন্য অধিকাংশ দাহ্য পদার্থকে প্রথমে জ্বলনাঙ্ক পর্যন্ত উত্তপ্ত করিতে হয় ; যথা,—প্রথমে দিয়াশলাই জ্বালিয়া বাতির জলনাঙ্ক পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। তবে বাতির কার্বন ও হাইড্রোজেনের সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেনের যে রাসায়নিক ক্রিয়া হয় তাহাতে তাপ উদ্ভূত হয়। এই তাপই বাতির পরবর্তী অংশকে জ্বলনাঙ্ক পর্যন্ত উত্তপ্ত রাখে।

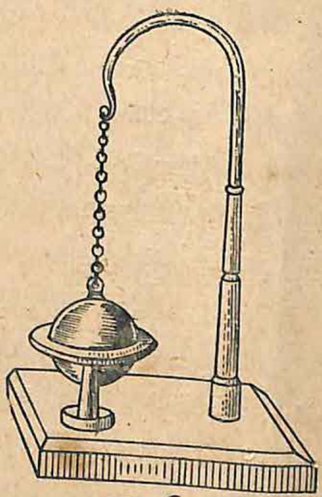
(খ) **অবস্থার পরিবর্তন** (Change of state) : যে-কোন পদার্থ তিন অবস্থায় থাকিতে পারে—যথা, কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। বরফ কঠিন, জল তরল ও বাষ্প গ্যাসীয় অবস্থা। তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিতে পদার্থের এই অবস্থান্তর ঘটে। তাপ বৃদ্ধি করিলে কঠিন বরফ গলিয়া জল হয়, আরও তাপ দিলে জল বাষ্প হয় ; আবার বাষ্পের তাপের হ্রাস করিলে জল হয় এবং জলের তাপ হ্রাস করিলে বরফ হয়।

তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিতে প্রত্যেক পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। লোহাকে খুব উত্তপ্ত করিলে গলান যায়। পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনের সময় আয়তনেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। সাধারণত কঠিন বস্তু তরল হইলে আয়তনে বাড়ে কিন্তু কঠিন লোহা ও বরফ তরল হইলে আয়তনে কমে। সেইজন্য বরফ জলে ভাসে এবং কঠিন লোহা গালান লোহার উপর ভাসে। গালান লোহা ছাঁচে ঢালিলে কঠিন হইবার সময় আয়তনে বাড়ে; সেইজন্য কঠিন লোহা ছাঁচের প্রত্যেক অংশে আঁটিয়া ধরে। ঢালাই দ্রব্য হুবহু ছাঁচের মত হয়। একটি বোতলে জল কানায় কানায় ভর্তি করিয়া শীতল করিয়া বরফে পরিণত কর। জল অপেক্ষা বরফ আয়তনে বাড়ে বলিয়া বোতল ফাটিয়া যাইবে।

(ঘ) **আকারের পরিবর্তন:** কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় প্রত্যেক পদার্থ তাপের বৃদ্ধিতে প্রসারিত হয় এবং তাপের হ্রাসে সঙ্কুচিত হয়।

(১) **কঠিনের বিস্তৃতি:** কঠিন বস্তুর বিস্তৃতি খুব কম বলিয়া উহা আমরা খালি চোখে দেখিতে পাই না।

**পরীক্ষা:** একটি পিতলের গোলাকার বল লও এবং ঐ বলের প্রায় সমব্যাসযুক্ত একটি আংটা লও। শীতল অবস্থায় বলটি আংটার গা ঘেঁষিয়া গলিয়া যায় কিন্তু বলটিকে গরম করিলে উহার আয়তন বাড়ে; সেইজন্য তখন উহা আংটার মধ্য দিয়া গলে না।

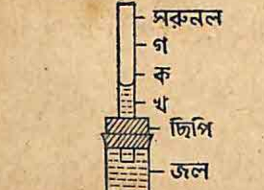

৩৩নং চিত্র

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কঠিন পদার্থের এই বিস্তৃতির অনেক ঘটনা দেখি। রেল লাইন পাতিবার সময় দুইটি লোহার

রেলের মধ্যে একটু ফাঁক থাকে কেন ? দ্রুতগামী ট্রেনের চাকার ঘর্ষণে উৎপন্ন তাপে রেল প্রসারিত হয়। ঐ প্রসারিত রেল যাহাতে বাঁকিয়া না যায়, সেইজন্য দুই রেলের মধ্যে ফাঁক থাকে। খুব মোটা কাচপাত্রে ফুটন্ত জল বা বরফ জল ঢালিলে পাত্রটির সর্বত্র সমভাবে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয় না বলিয়া উহা ফাটিয়া যায়। উত্তাপে প্রসারিত লোহার বেড়কে কাঠের চাকার পরিধির গায়ে লাগাইয়া জল ঢালিলে বেড়টি সঙ্কুচিত হইয়া চাকার গায়ে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া যায়। শিশির মুখে কাচের ছিপি আটকাইয়া গেলে শিশির মুখ গরম করিলে উহা একটু বড় হয় কিন্তু ছিপি বড় হয় না ; কাজেই ছিপি খুলিয়া যায়।

(২) **তরলের বিস্তৃতি ঃ**

**পরীক্ষা ঃ** একটি বড় ফ্লাস্ক বা কাচ-কুপীর মুখে রবারের ছিপি আঁটিয়া দাও। ছিপির মধ্য দিয়া একটি দুই মুখ খোলা সরু কাচের নল লাগাও।




৩৪নং চিত্র

কুপীটি লাল জলে পূর্ণ কর, যাহাতে জলতল নলের মধ্যস্থলে ক-তে থাকে। কুপীটি গরম কর। প্রথমে কঠিন বস্তু কুপীটি আয়তনে বাড়ে, সেইজন্য জলতল একটু নামিয়া খ-তে আসে। তারপর আরও তাপ-বৃদ্ধিতে জলের আয়তন বৃদ্ধি হয় এবং জলতল নল দিয়া উপরে উঠে। একই পরিমাণ তাপের প্রভাবে কঠিন ফ্লাস্কের চেয়ে তরল জলের আয়তন-বৃদ্ধি বেশী বলিয়া জলতল গ-তে আসে।

(৩) **তাপে বায়ুর বিস্তৃতি ঃ**

**পরীক্ষা ঃ** একটি বায়ুপূর্ণ কুপীর মুখে একটি ছিপি লাগাও। ছিপির মধ্য দিয়া একটি লম্বা নল লাগাও। কুপীটি উপরে রাখিয়া নলের

অপর প্রান্ত একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে রাখ। এখন কুপীটি উষ্ণ করিলে ভিতরের বায়ু প্রসারিত হইয়া বুদ্‌বুদের আকারে জলের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। কুপীকে ঠাণ্ডা করিলে ভিতরের বায়ু সঙ্কুচিত হয়, তখন জল নলের ভিতর দিয়া উপরে উঠে। কড়াইয়ে দুধ গরম করিবার সময় দুধ উথ্‌লাইয়া উঠে এবং কড়া ছাপাইয়া পড়ে। বাস্তবিক কি অল্প দুধ গরম হইয়া এক কড়া হয়? তা নয়; দুধের মধ্যে বায়ু থাকে। এই বায়ু গরম হইয়া ফুলিয়া উঠে। সেইজন্য দুধ উথ্‌লায়। লুচি বা রুটি ফোলে কেন? আটাকে জল দিয়া ছানিবার সময় আটার কণার ফাঁকে ফাঁকে অনেক বায়ু প্রবেশ করে। কড়াতে বা তাওয়ায় গরম করিবার সময় রুটির বা লুচির উপর ও নীচের পিঠ শুকাইয়া যায়। ভিতরে থাকে ভিজা আটা ও বায়ু। বায়ু ও ভিজা আটার জল তাপ পাইলে ফুলিয়া উঠে।

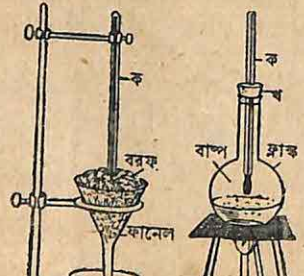
৪। **থার্মমিটার বা উষ্ণতামান যন্ত্র** (Thermometer): আমরা সাধারণত স্পর্শ দ্বারা উষ্ণতা অনুভব করি। গায়ে হাত দিয়া জ্বর হইয়াছে কিনা দেখি। স্পর্শ করিয়া কোন বস্তুর সঠিক উষ্ণতা বুঝা যায় না। পাশাপাশি অবস্থিত একটি কাঁসার গ্লাসে হাত দিলে বেশী ঠাণ্ডা এবং কাঠের দ্রব্যে হাত দিলে কম ঠাণ্ডা বোধ হয়। ধাতুর তাপ-পরিচালন শক্তি বেশী বলিয়া এইরূপ হয়। আমাদের শরীরের তাপ শীঘ্র ধাতুর মধ্য দিয়া পরিবাহিত হয় বলিয়া আমরা ঠাণ্ডা বোধ করি। ডান হাত উষ্ণ জলে এবং বাম হাত বরফ জলে ডুবাইয়া দুই হাত একসঙ্গে ঈষদুষ্ণ জলে রাখিলে ডান হাত শীতল এবং বাম হাত উষ্ণ বোধ হইবে। সুতরাং স্পর্শ দ্বারা কোন দ্রব্যের প্রকৃত উষ্ণতা বুঝা যায় না।

তাপ প্রয়োগে পদার্থ বিস্তৃত হয়। পদার্থের বিস্তৃতি দ্বারা উষ্ণতা মাপা হয়। কঠিনের বিস্তৃতি খুব কম এবং গ্যাসের বিস্তৃতি খুব বেশী;

সুতরাং তরলের বিস্তৃতি দ্বারা সাধারণত উষ্ণতা মাপ হয়; আবার তরলের মধ্যে পারদের বিস্তৃতি দ্বারা উষ্ণতা মাপা সুবিধাজনক; কারণ (i) পারদ কাচের গায়ে লাগে না; (ii) ইহা বেশী উষ্ণতায় বাষ্প হয়; (iii) অন্য তরলের তুলনায় ইহার বিস্তৃতির হার বেশী; (iv) ইহা তাপের সুপরিবাহী; (v) ইহা সহজেই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।

যে যন্ত্র দিয়া উষ্ণতা মাপা যায়, তাহাকে **উষ্ণতামান যন্ত্র** বা **থার্মমিটার** বলে।

একটি চুলের মত অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট কাচনলের এক প্রান্ত আগুনে একটু গলাইয়া ফুঁ দিলে একটি কুণ্ড (bulb) প্রস্তুত হয়। নলের অপর প্রান্তে একটি ছোট কুপী সংযুক্ত করিয়া কুপীর উপর বিশুদ্ধ পারদ ঢালা হয়। এখন কুণ্ডকে পর্যায়ক্রমে গরম ও শীতল করিয়া কুণ্ডটিকে কিছু পারদে ভর্তি করা হয়। কুণ্ডের পারদকে ফুটাইয়া খোলা মুখ আগুনে গলাইয়া বন্ধ করা হয়। এখন নলের ভিতর পারদ ও উহার বাষ্প থাকিল।

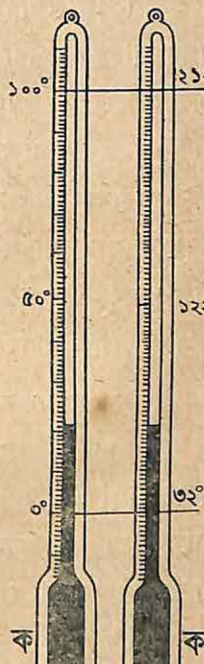


৩৫নং চিত্র

কুণ্ডটিকে কিছুক্ষণ বরফ-চুর্ণে ডুবাইয়া রাখিলে পারদ নামিয়া এক জায়গায় স্থির থাকে। নলের এই স্থানে একটি দাগ কাটা হয়। এই দাগকে **হিমাঙ্ক** বলে, কারণ জল এই উষ্ণতায় জমে।

কুণ্ডটিকে ফুটন্ত জলের বাষ্পে রাখিলে পারদ উপরে উঠিয়া এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকে। নলের ঐ স্থানে পুনরায় একটা দাগ কাটা হয়। এই দাগকে **স্ফুটনাঙ্ক** বলে।

সাধারণত দুই রকম থার্মমিটার ব্যবহৃত হয়, যথা **সেণ্টিগ্রেড** (Centigrade) ও **ফারেনহিট** (Fahrenheit)। সেণ্টিগ্রেড থার্মমিটারে হিমাঙ্ককে ০ ও স্ফুটনাঙ্ককে ১০০ ধরিয়া ইহাদের মধ্যবর্তী স্থানকে ১০০ সমান অংশে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রী (degree) বলে। বৈজ্ঞানিক কার্যে এই থার্মমিটার ব্যবহৃত হয়। ফারেনহিট থার্মমিটারে হিমাঙ্ককে ৩২ এবং স্ফুটনাঙ্ককে ২১২ ধরিয়া মধ্যবর্তী স্থানকে ১৮০ সমান অংশে ভাগ করা হয়। এক এক ভাগকে ডিগ্রী বলে।



৩৬নং চিত্র

জ্বর দেখিবার থার্মমিটারে ফারেনহিট স্কেল ব্যবহৃত হয়। তবে ইহার একটি বিশেষত্ব আছে। জীবিত অবস্থায় মানুষের উষ্ণতা ৯৫° হইতে ১১০° ডিগ্রী পর্যন্ত হইতে পারে; সুতরাং এইরূপ থার্মমিটারে ৯৫° হইতে ১১০° ডিগ্রী পর্যন্ত প্রত্যেক ডিগ্রীতে বড় দাগ কাটা থাকে। প্রত্যেক বড় ঘর আবার পাঁচটি সমান অংশে ভাগ করা থাকে। সুস্থ ব্যক্তির শরীরের উষ্ণতা ৯৮·৪° ডিগ্রী ফাঃ; সুতরাং এই দাগে একটি চিহ্ন থাকে। কুণ্ডের ঠিক উপরে নলটি খুব সরু হইয়া গিয়াছে যাহাতে বগল বা মুখ হইতে থার্মমিটার বাহির করিলে ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া পারদ সঙ্কুচিত হইয়া কুণ্ডের ভিতরে না ঢোকে। কোন দ্রব্যের উষ্ণতা দেখিতে হইলে কুণ্ডকে উষ্ণ দ্রব্যের সংস্পর্শে রাখিতে হয়।

৫। **তাপ-চলাচল** (Transference of heat) : তাপ উষ্ণ বস্তু হইতে শীতল বস্তুতে তিন প্রকারে সঞ্চালিত হয়। যথা :—পরিবহন (conduction), পরিচলন (convection) ও বিকিরণ (radiation)।

**পরিচলন** : জ্বলন্ত উনানে লোহার হাতার এক প্রান্ত ধরিলে কিছুক্ষণ পরে অপর প্রান্ত গরম হইয়া উঠে। তাপশক্তি হাতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চলিয়া আসে। প্রত্যেক পদার্থের ন্যায় হাতাও কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম কণা দিয়া গঠিত। ইহাদিগকে অণু বলে। আগুনের সংস্পর্শে যে অংশ থাকে তাহার অণুগুলি প্রথমে উষ্ণ হয়। এই অণুগুলি পরবর্তী অণুগুলিকে তাপশক্তি বহন করিয়া দেয়, কিন্তু অণুগুলি স্থান পরিবর্তন করে না। এইরূপে উষ্ণ অণুগুলি পর পর শীতল অণুতে তাপ বহন করে। এইরূপ তাপ-চলাচলকে **পরিবহন** বলে। কঠিন পদার্থমাত্রই এই প্রণালীতে উষ্ণ হয়।

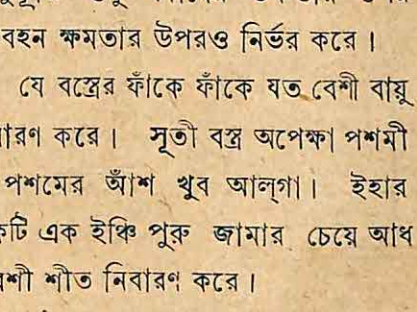
সকল পদার্থের মধ্য দিয়া তাপ সমানভাবে পরিবাহিত হয় না। যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়া তাপ খুব শীঘ্র পরিবাহিত হয়, তাহাদিগকে **সুপরিবাহী** ( good conductor ) বলে। যাহাদের মধ্য দিয়া তাপ ধীরে ধীরে যায়, তাহারা তাপের **কুপরিবাহী** ( bad conductor )। ধাতু ও পাথর তাপের **সুপরিবাহী** ; মাটি, কাঠ, তুলা, পশম, ফ্লানেল, জল ও বায়ু তাপের **কুপরিবাহী**। এ্যালুমিনিয়ামের পেয়ালায় চা পান করিলে ঠোঁট পুড়িয়া যায়, কিন্তু চীনামাটির পেয়ালায় অনায়াসে চা পান করা যায়। এ্যালুমিনিয়ামের কেটলির হাতল বেত দিয়া মোড়া থাকে, যাহাতে হাতে তাপ না লাগে। টিনের ঘর শীতকালে খুব শীতল হয় এবং গ্রীষ্মকালে খুব উষ্ণ হয়, কিন্তু খড়ের চালের ঘর খুব শীতল বা খুব উষ্ণ হয় না। কাঠের পরিবহন-ক্ষমতা কম বলিয়া বরফ কাঠের গুঁড়ার মধ্যে রাখা হয়। জল তাপের কুপরিবাহী। পাখীর পালক ও মেষের পশমের তাপ-পরিবহন ক্ষমতা কম

বলিয়া উহাদের লোমে প্রস্তুত বস্ত্র শীতকালে আমরা ব্যবহার করি। এইগুলিকে 'গরম বস্ত্র' বলিলেও ইহারা অন্য বস্ত্রের চেয়ে উষ্ণ নহে। ইহাদের তাপ-পরিবাহিতা কম বলিয়া বস্ত্রগুলির এই নাম। শীতকালে পশুপক্ষিগণ পালক বা পশম দিয়া নিজেদের শীত হইতে রক্ষা করে।

একই উষ্ণতায় পাশাপাশি অবস্থিত কাঠ অপেক্ষা লোহা কেন শীতল বোধ হয়? কারণ, লোহা সুপরিবাহী বলিয়া দেহ হইতে শীঘ্র তাপ লোহায় চলিয়া যায়, সেইজন্য আমরা শীতল বোধ করি। অর্থাৎ আমাদের শীতোষ্ণতা অনুভূতি শুধু পদার্থের উষ্ণতার উপর নির্ভর করে না; উহার তাপ-পরিবহন ক্ষমতার উপরও নির্ভর করে।

বায়ুর তাপ-পরিবাহিতা কম। যে বস্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে যত বেশী বায়ু থাকে, তাহা তত বেশী শীত নিবারণ করে। সূতী বস্ত্র অপেক্ষা পশমী বস্ত্র বেশী গরম বোধ হয়, কারণ পশমের আঁশ খুব আল্‌গা। ইহার ফাঁকে ফাঁকে বায়ু থাকে। একটি এক ইঞ্চি পুরু জামার চেয়ে আধ ইঞ্চি পুরু দুইটি জামা পরিলে বেশী শীত নিবারণ করে।

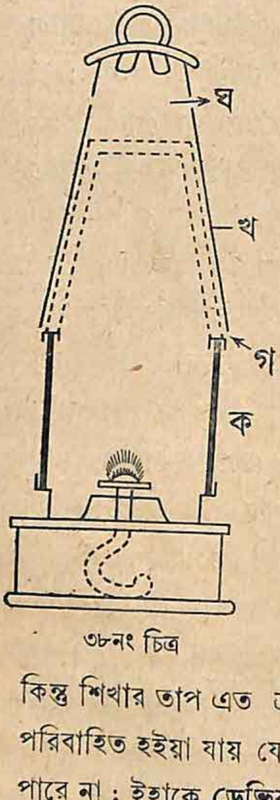
পাতলা কাগজের পাত্রে জল রাখিয়া আগুনে জলকে ১০০°C. উষ্ণতায় ফুটান সম্ভব। কাগজ পোড়ে না কারণ পাতলা কাগজের মধ্য দিয়া তাপ শীঘ্র শীঘ্র পরিবাহিত হইয়া জলে চলিয়া যায়।



৩৭নং চিত্র

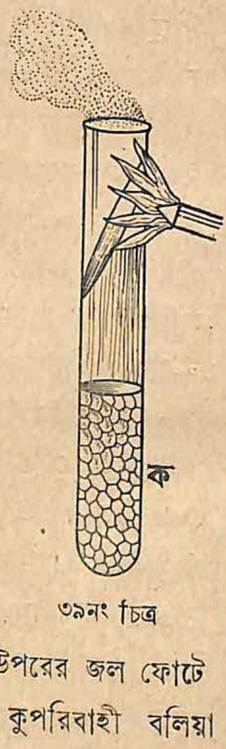
**পরীক্ষা**ঃ বুনসেন দীপের শিখার উপর একটি তামার তারের জাল ধর। তারের নীচে গ্যাস জ্বলে, উপরে জ্বলে না। আবার দীপের একটু উপরে

জাল রাখিয়া গ্যাস খুলিয়া দাও, উপরে গ্যাস জ্বালিয়া দাও, গ্যাস উপরে জ্বলে কিন্তু নীচে জ্বলে না। কেন এমন হয়? ধাতব জাল তাপের সুপরিবাহী; সেজন্য উভয় ক্ষেত্রে জালের মধ্য দিয়া তাপ শীঘ্র পরিবাহিত হইয়া বায়ুতে ছড়াইয়া পড়ে। প্রথম ক্ষেত্রে উপরের গ্যাস, শেষের ক্ষেত্রে নীচের গ্যাস জ্বলে না।



৩৮নং চিত্র

কোন কোন কয়লার খনিতে বিস্ফোরক গ্যাস মিশ্রণ থাকে অর্থাৎ এই গ্যাসে কোন রকমে আগুন লাগিলে বিস্ফোরণ হয়। সেই জন্য তারের ঘন জাল দিয়া এক রকম আলো প্রস্তুত হয়। ভিতরে গ্যাস জ্বলিতে থাকে কিন্তু শিখার তাপ এত দ্রুত তারের জাল দিয়া পরিবাহিত হইয়া যায় যে বাহিরের গ্যাস জ্বলিতে পারে না; ইহাকে **ডেভির নিরাপদ আলো** বলে।

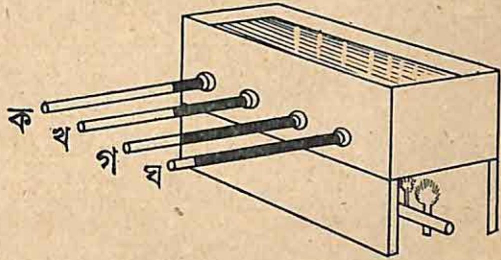


৩৯নং চিত্র

**পরীক্ষা :** একটি দীর্ঘ পরীক্ষা-নল প্রায় জলে ভর্তি কর। কিছু বরফ তামার তারে জড়াইয়া পরীক্ষা-নলের নীচে ডুবাইয়া রাখ যাহাতে না ভাসে। পরীক্ষা-নলের উপর দিক গরম কর। উপরের জল ফোটে কিন্তু নীচের বরফ গলে না। জল তাপের কুপরিবাহী বলিয়া উপরের তাপ নীচে আসিতে দেরী লাগে।

গ্রীষ্মকালে পুকুরের উপরকার জল উষ্ণ হইলেও নীচের জল শীতল থাকে।

**পরীক্ষা ঃ** বিভিন্ন ধাতুর বিভিন্ন পরিবহন-ক্ষমতা আছে। একটি ধাতুপাত্রের সহিত একই দৈর্ঘ্য ও একই ব্যাস বিশিষ্ট বিভিন্ন ধাতুর দণ্ড (**ক খ গ ঘ**) লাগান থা কে। দণ্ডগুলির বাহিরের অংশ মোমে আবৃত থাকে। পাত্রের মধ্যে জল রা খি য়া ফুটাইলে দেখা যাইবে একই সময়ে বিভিন্ন

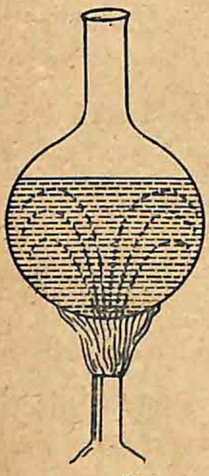



৪০নং চিত্র

দণ্ডের মোম বিভিন্ন দূরত্ব পর্যন্ত গলিয়াছে অর্থাৎ বিভিন্ন ধাতুর পরিবাহিতা বিভিন্ন।

**পরিচলন ঃ** জলের তাপ-পরিবহন শক্তি কম। তবে কি করিয়া এক হাঁড়ি জল ফুটিয়া উঠে ? কোন তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ উত্তপ্ত হইলে আগুনের নিকটবর্তী নীচের স্তর প্রথমে উষ্ণ হইয়া প্রসারিত হয়। ফলে ইহা উপরের স্তর অপেক্ষা হাল্‌কা হয় এবং উপরের দিকে উঠিতে থাকে। সেখানে উপরের শীতল ও অপেক্ষাকৃত ভারী তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ চতুর্দিক হইতে আসিয়া ঐ স্থান দখল করে। উক্ত উষ্ণ স্তর উপরে যাইবার সময় শীতল স্তরকে উত্তপ্ত করিতে করিতে যায়। এইরূপে উপর হইতে নীচে এবং নীচে হইতে উপরে তরল বা গ্যাসীয় দুইটি পদার্থই চলিতে থাকে, যতক্ষণ না সমস্ত তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ একই উষ্ণতায় আসে। এই প্রবাহকে **পরিচলন স্রোত** বলে। এরূপে সমস্ত তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ উত্তপ্ত হয়। এই তাপ-চলাচলকে **পরিচলন** বলে। এই প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত অণুগুলিই চলাচল করে।

**তরলের পরিচলন ঃ পরীক্ষা ঃ** একটি কাচপাত্রে জল লও। পাত্রের তলায়মাঝখানে একটু তুঁতে ফেলিয়া দাও। তুঁতে দ্রবীভূত হইয়া তলদেশের জলকে রঙিন করে। পাত্রটিকে গরম কর। দেখ তুঁতের রঙিন জল ফ্লাস্কের মাঝখান দিয়া কেমন উপরে উঠিতে থাকে। পরিচলন স্রোত স্পষ্ট দেখা যায়।



৪১নং চিত্র

গ্যাসের পরিচলনের অর্থাৎ উষ্ণ বায়ুর উর্ধ্বগতির ও শীতল বায়ুর নিম্নগতির বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়া হইয়াছে। বাতির শিখার একটু উপরে হাত দিলে গরম বোধ করি। শিখার সংস্পর্শে বায়ু উষ্ণ ও হাল্‌কা হইয়া উপরের দিকে উঠে এবং চারিপাশের শীতল ও ভারীবায়ু সেই স্থান অধিকার করে। নীচ হইতে শীতল বায়ু ঢুকিবার জন্য আলোর বা উনানের নীচের দিকে ছিদ্র থাকে।

বিভিন্ন স্থানের বায়ুতে উষ্ণতার পার্থক্যের জন্যই বিভিন্ন বায়ু-স্রোতের উৎপত্তি হয়; যথা—স্থল-বায়ু. জল-বায়ু, ঝড়, টাইফুন ইত্যাদি।

**বিকিরণ ঃ** উপরোক্ত দুই প্রকারের তাপ-চলাচলে যে-কোন পদার্থের সাহায্য দরকার কিন্তু বিকিরণে এইরূপ কোন পদার্থের দরকার হয় না। সূর্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাহির হইতে প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার মধ্যে কোন জড় পদার্থ নাই, কেবল মহাশূন্য ; সুতরাং পরিচলন বা পরিবহন কোন প্রণালীতেই সূর্য হইতে তাপ আসিতে পারে না। একমাত্র বিকিরণ প্রণালীতে সূর্য হইতে তাপ আসে। পৃথিবীতে সূর্যের তাপ আসে কিন্তু বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয় না ; এই প্রণালীকে **বিকিরণ প্রণালী** বলে। প্রত্যেক উত্তপ্ত পদার্থ

হইতে তাপ বিকীর্ণ হয়। বিকীর্ণ তাপ কোন শীতল বস্তুতে পড়িলে উহা তাপ শোষণ করে।

**বিকিরণের বিশেষত্ব ঃ** (১) বিকিরণে তাপ-শক্তি কোন মাধ্যম (যথা বায়ু) বা শূন্যের মধ্য দিয়া যাইতে পারে। (২) মাধ্যমের উষ্ণতার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। (৩) বিকিরণ খুব দ্রুত প্রণালী।

**বিকিরণের দৃষ্টান্ত ঃ** (১) আগুনের পাশে দাঁড়াইলে বিকীর্ণ তাপের জন্য আমরা গরম বোধ করি। কারণ পরিচলন স্রোত ঊর্ধ্ব-গামী। ইহা কখনও পাশের দিকে যায় না। (২) রৌদ্রে দাঁড়াইয়া মাথার উপর ছাতা ধরিলে আর গরম লাগে না অর্থাৎ বিকীর্ণ তাপ বায়ুর ভিতর দিয়া যাইলেও বায়ুকে গরম করে না, কিন্তু ছাতার কাপড়ে হাত দিলে গরম লাগে অর্থাৎ ছাতার কাপড় বিকীর্ণ তাপ শোষণ করে। (৩) সকল দ্রব্যের তাপ বিকিরণ বা শোষণ করার ক্ষমতা সমান নয়। চক্‌চকে দ্রব্য কম তাপ বিকীর্ণ করে। কাল দ্রব্য বেশী তাপ শোষণ করে, সাদা দ্রব্য কম তাপ শোষণ করে। সেইজন্য চক্‌চকে ধাতব পাত্র অপেক্ষা কাল পাথরের বাটিতে গরম দুধ শীঘ্র জুড়ায়। আমরা গ্রীষ্মকালে সাদা পোষাক ও শীতকালে কাল পোষাক পরি। সাদা রংয়ের বাড়ী গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা এবং শীতকালে গরম থাকে। (৪) আর্দ্র বায়ু বেশী বিকীর্ণ তাপ শোষণ করে। শুষ্ক বায়ু কম তাপ শোষণ করে।

**তাপ** (Thermos) **ফ্লাস্ক**—কোন পদার্থকে একই উষ্ণতায় রাখার জন্য আমরা 'থার্মো ফ্লাস্ক' ব্যবহার করি। ইহার ভিতর গরম দুধ বা চা রাখিলে সহজে ঠাণ্ডা হয় না। বরফ রাখিলেও সহজে উহা গলে না। এই ফ্লাস্ক দুইটি-দেওয়াল-বিশিষ্ট একটি কাচপাত্র। এই পাত্রটি যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায়, সেইজন্য ইহার বাহিরে একটি ধাতুপাত্র থাকে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, তাপ-চলাচল তিন প্রকারে

হয়। Thermos flask এমনভাবে নির্মাণ করা হয় যে, পূর্বোক্ত তিন প্রকারেই তাপক্ষয় যতদূর সম্ভব কম হইয়া যায়। পরিবহন




৪২নং চিত্র

ও পরিচলন প্রণালীতে তাপক্ষয় নিবারণ করিবার জন্য কাচ-পাত্রের দুই দেওয়ালের ভিতরটা বায়ুশূন্য করা হইয়া থাকে। আবার কাচপাত্রটির নীচে শোলা থাকে বলিয়া পাত্রের তলদেশের মধ্য দিয়া তাপ পরিবাহিত হয় না। কাচপাত্রের উভয় দেওয়ালের ভিতর দিক্ পারদের প্রলেপ দিয়া চক্‌চকে করা হয়। ইহাতে ভিতরের বা বাহিরের বিকীর্ণ তাপ প্রলেপে প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া যায়। কাজেই কাচপাত্রের ভিতরে গরম বা ঠাণ্ডা যাহা কিছু রাখা যায়, তাহাই সেই অবস্থায় অনেকক্ষণ থাকে।

৬। (ক) **আলোক ( Light ) ঃ** কোন দ্রব্য দেখিবার জন্য দুইটি জিনিষের প্রয়োজন—একটি চোখ, অপরটি আলোক। দিন-দুপুরে চোখ বাঁধিয়া দিলে আলোক থাকিলেও চোখের অভাবে কিছুই দেখিতে পাই না। আবার অন্ধকার ঘরে চোখ মেলিয়া থাকিলেও আলোকের অভাবে কিছুই দেখিতে পাই না। অতএব চোখের দর্শন-অনুভূতি জাগ্রত করিবার বাহ্যিক কারণ হইল আলোক। দৃশ্য বস্তু হইতে আলোকরশ্মি আমাদের চোখে প্রবেশ করিয়া আমাদের দর্শন অনুভূতি জাগ্রত করে।

(খ) **আলোক বিকীর্ণ শক্তি ঃ** আলোক এক প্রকার শক্তি। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, উত্তপ্ত পদার্থ হইতে শক্তি বিকীর্ণ হয়। এই

শক্তি কোন বস্তুতে পড়িলে তাহাকে দেখা যায়। ইহাকে আলোক বলে। যদি এই শক্তি কোন বস্তুকে উত্তপ্ত করে তখন তাহাকে তাপ বলে। অতএব আলোককে দৃশ্য বিকীর্ণ শক্তি বলা যায়। অন্ধকার ঘরে কম উষ্ণতার জিনিষ দেখা যায় না, তখন ইহা কেবল তাপ বিকিরণ করে। যখন ইহার উষ্ণতা বাড়িয়া যায় তখন ইহা তাপ ও আলো দুই-ই বিকীর্ণ করে। আলোক-শক্তিকে অন্য বিভিন্ন শক্তিতে এবং বিভিন্ন শক্তিকে আলোক-শক্তিতে পরিণত করা যায়ঃ—

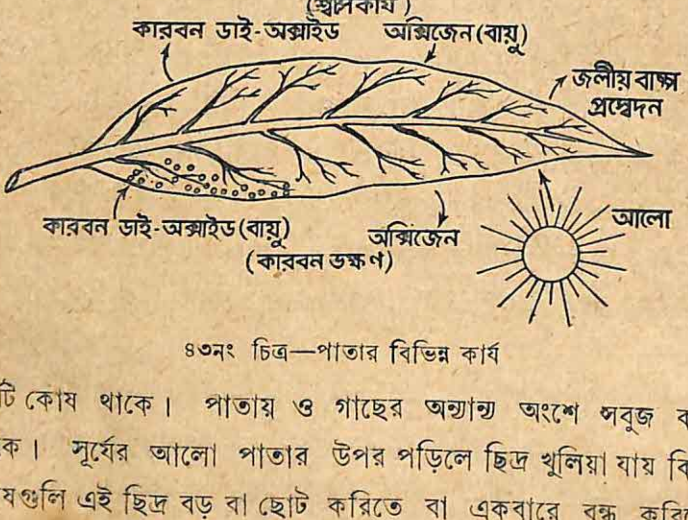
(১) দুই খণ্ড পাথর ঠুকিলে প্রথমে তাপ এবং পরে আলোক-শক্তি উৎপন্ন হয়। ইহা যান্ত্রিক শক্তি হইতে আলোক-শক্তিতে পরিণতির দৃষ্টান্ত। (২) পাতলা প্ল্যাটিনাম পাতের উপর আলোক-রশ্মি ফেলিলে উহা ঘুরিতে থাকে। ইহা আলো-শক্তি হইতে যান্ত্রিক-শক্তিতে পরিণতির দৃষ্টান্ত। (৩) বাতির দহনে আলোকের উৎপত্তি—রাসায়নিক শক্তি হইতে আলোক-শক্তিতে পরিণতির দৃষ্টান্ত। (৪) বিজলি বাতি বৈদ্যুতিক শক্তির আলোকে পরিণতির দৃষ্টান্ত।

পুকুরের জলে একটি ঢিল ফেলিলে জলে তরঙ্গ উত্থিত হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। সেইরূপ উত্তপ্ত পদার্থ হইতে তরঙ্গ উত্থিত হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এক প্রকার তরঙ্গ হইতে আলোকের উৎপত্তি হয়। এই বিষয়ে তোমরা পরে আরও শিখিবে।

আলোক-তরঙ্গ অন্য বস্তুতে পড়িলে আমরা সেই বস্তু দেখিতে পাই কিন্তু আলোক নিজে অদৃশ্য। ধূলিশূন্য ঘরের কোন ছিদ্র দিয়া সূর্যালোক প্রবেশ করিলে রশ্মির পথ দেখা যায় না। যদি ঘরে ধূলি উড়াইয়া দেওয়া হয়, তবে ধূলিকণা হইতে বিক্ষিপ্ত আলোকে আমরা ধূলিকণা দেখিতে পাই। রাত্রে দূরে উজ্জ্বল আলোকিত বস্তু দেখিতে পাই। মধ্যখানে আলোকের পথ অন্ধকার থাকে।

(গ) **কার্বন-আত্মকরণ** ( Photosynthesis ) : সকল জীবের দেহগঠনের পক্ষে কার্বন দরকার। উদ্ভিদ্ বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে এই কার্বন সংগ্রহ করে এবং নানাপ্রকার জটিল খাদ্য প্রস্তুত করে। প্রাণী নিজে এইরূপ কার্বন সংগ্রহ করিতে বা জটিল খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না।

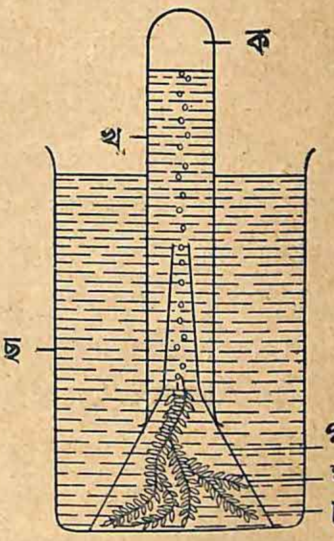
উদ্ভিদের পাতায় অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র বা রন্ধ্র থাকে। ইহাদিগকে খালি চোখে দেখা যায় না। প্রত্যেক রন্ধ্রের দুই দিকে




৪৩নং চিত্র—পাতার বিভিন্ন কার্য

দুইটি কোষ থাকে। পাতায় ও গাছের অন্যান্য অংশে সবুজ কণা থাকে। সূর্যের আলো পাতার উপর পড়িলে ছিদ্র খুলিয়া যায় কিন্তু কোষগুলি এই ছিদ্র বড় বা ছোট করিতে বা একবারে বন্ধ করিতে পারে। কার্বন ডাই-অক্সাইড সমেত বায়ু এই রন্ধ্রের মধ্য দিয়া পাতায় প্রবেশ করে। আবার মূল হইতে নানা খাদ্যযুক্ত শোষিত রস ( উদ্ভিদ্-বিদ্যায় এই বিষয় বলা হইয়াছে ) পাতায় হাজির হয়। এখন উদ্ভিদ্ সূর্যকিরণ ও সবুজ কণার সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের কার্বন গ্রহণ করিয়া চিনি প্রস্তুত করে এবং অক্সিজেন বায়ুতে ত্যাগ করে। দিনের বেলা সূর্যের আলোয় এই প্রকার খাদ্য প্রস্তুত হয়। ইহাকে **কার্বন-আত্মকরণ** বলে।

**পরীক্ষা ঃ** একটি কাচপাত্রে কিছু শ্যাওলা বা ঝাঁঝি লও। ইহার উপর একটি কাচের চুঙি (গ) উপুড় কর। কাচপাত্রে এরূপ জল ঢাল যাহাতে চুঙির নলটি সম্পূর্ণ জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। একটি পরীক্ষা-নল (খ) জলপূর্ণ করিয়া আঙুল দিয়া চাপিয়া চুঙির নলের উপর উপুড় করিয়া দাও। কাচপাত্রকে রৌদ্রে রাখ। এইবার ঝাঁঝি বা শ্যাওলা হইতে বুদ্‌বুদ্‌ বাহির হইয়া পরীক্ষা-নলে জমা হয়। আঙুল দিয়া চাপিয়া পরীক্ষা-নলকে জল হইতে বাহির কর। আঙুল সরাইয়া শিখাহীন জ্বলন্ত কাঠি পরীক্ষা-নলে প্রবেশ করাইলে উহা দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। সুতরাং ঐ গ্যাস অক্সিজেন (ক)। পাত্রটিকে অন্ধকারে রাখিলে সূর্যের আলো ব্যতীত গ্যাসের বুদ্‌বুদ্‌ উঠা বন্ধ হয়।



৪৪নং চিত্র

**পরীক্ষা ঃ** সবুজ ঘাসের উপর বিচালি চাপা দাও। তিন-চারি দিনের মধ্যে সূর্যের আলোর অভাবে ঘাস সাদা ও নিস্তেজ হইয়া যাইবে। কয়েক দিনের মধ্যে গাছ মরিয়া যাইবে। আলোর অভাবে গাছের খাদ্য-প্রস্তুতি বন্ধ হয় বলিয়া উহা মরিয়া যায়।

অতএব দেখা যায়, পাতা হইল একটি সম্পূর্ণ রান্নাঘর। অবার পাতা হইল হাঁড়ি, সবুজ কণা হইল রাঁধুনি, মাটির শোষিত রস ও কার্বন ডাই-অক্সাইড হইল কাঁচা খাবার, সূর্যের আলো হইল আগুন।

---

## চতুর্থ অধ্যায়

## সজীব পদার্থ ( Living Objects )

### ১। (ক) সজীব পদার্থ ও জড়ের পার্থক্য

যে সকল পদার্থের প্রাণ আছে তাহাদিগকে **সজীব পদার্থ** বলে ; যথা—পশুপক্ষী, পোকামাকড়, মানুষ, গাছপালা ইত্যাদি। যে সকল পদার্থের প্রাণ নাই, তাহাদিগকে **জড় পদার্থ** বলে ; যথা—ইট, কাঠ পাথর, মাটি, ঘরবাড়ী ইত্যাদি।

**সজীব পদার্থের নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায় ঃ—**

(১) **খাদ্যগ্রহণ, দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি**—সজীব পদার্থ মাত্রই আহার করিয়া দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি করে। জীব নিয়ত নানাপ্রকারে শক্তি ক্ষয় করিতেছে। এই শক্তি পূরণ করিবার জন্য আহারের প্রয়োজন। প্রাণী ও উদ্ভিদ্ উভয়েই আহার করে আবার জলপানও করে। আহার করিয়া ছোট শিশু কত বড় মানুষ হয়! চারা গাছ আহার করিয়া কত বড় বৃক্ষ হয়! লাউ-কুমড়ার গাছ কত শীঘ্র বাড়ে! একটি কুকুরছানাকে কয়েক দিন না খাইতে দিলে উহা মরিয়া যাইবে। শিমচারার শিকড় বা পাতা কাটিয়া দিলে উহা খাদ্যাভাবে মরিয়া যাইবে। জীব খাদ্য-পরিপাকের পর সারাংশ দেহসাৎ করিয়া দেহের বৃদ্ধি করে। উদ্ভিদের সকল অংশ এক সঙ্গে বৃদ্ধি পায় না। মূলের আগার পরবর্তী অংশ এবং কাণ্ডের আগা সকলের চেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায়। প্রাণীদেহে বিশেষ বৃদ্ধির কোন অংশ নাই। সমস্ত দেহই একসঙ্গে বৃদ্ধি পায়। ইট, পাথর আহারও করে না, বা বড়ও হয় না।

(২) **শ্বাস-গ্রহণ**—সজীব পদার্থ মাত্রই বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড নামক অন্য একটি দূষিত গ্যাস

দেহ হইতে ত্যাগ করে। কুকুর-ছানাকে কিংবা শিমচারাকে বন্ধ জায়গায় রাখিয়া দিলে বায়ুর অভাবে উহারা মরিয়া যায়।

উদ্ভিদের বিশিষ্ট কোন শ্বাসযন্ত্র নাই। ইহা দেহের প্রায় সমস্ত অংশ দিয়া শ্বাসকার্য চালায়। কতক মেরুদণ্ডী প্রাণী ফুস্‌ফুস্ দিয়া এবং মাছ ফুলকা দিয়া শ্বাসকার্য চালায়। কিন্তু মাগুর ও কই মাছ ফুলকা ও অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র দিয়া, পতঙ্গ বায়ুনল দিয়া, আর কেঁচো ত্বকের ছিদ্র দিয়া শ্বাসকার্য চালায়।

সজীব পদার্থের দেহের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের সহিত অক্সিজেন সংযোগ হয়। ইহাতে তাপ, শক্তি ও অন্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ইহাতে আমরা কাজ করিবার শক্তি পাই। অতএব **সকল সজীব পদার্থের বাঁচিবার জন্য বায়ু ও খাদ্য দুই-ই দরকার।**

(৩) **গমন-শক্তি ও নড়াচড়া**—প্রত্যেক প্রাণীকে কোন-না-কোন কারণে নড়াচড়া করিতে হয়। গরু, ভেড়া, ছাগল সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘাস-পাতা খাইয়া বেড়ায়। আমরা সকল সময়েই হাত-পা নাড়িয়া কাজকর্ম করিতেছি। মানুষ, গরু, ভেড়া পা দিয়া চলে, পাখী পাখা দিয়া বাতাসে উড়ে, মাছ পাখ্‌না দিয়া জলে সাঁতার দেয়, সাপ বুক দিয়া মাটিতে চলে এবং কেঁচো দেহ পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিয়া চলে।

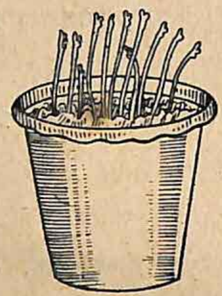
উদ্ভিদ্ প্রাণীর মত চলিতে পারে না বটে কিন্তু উহার দেহের বিভিন্ন অংশ নড়াচড়া করে। লতানে গাছ—যথা, কুমড়া, পটল গাছ লতাইয়া লতাইয়া চলে। কতকগুলি গাছ—যথা, শিম, অপরাজিতা অন্য গাছকে জড়াইয়া চলে। উদ্ভিদের মূল রস শোষণ করিবার জন্য মাটির ভিতর বহুদূর চলিয়া যায়।

জড় পদার্থ নিজ হইতে নড়িতে পারে না। ইটকে না নড়াইলে ইট এক জায়গাতেই থাকে।

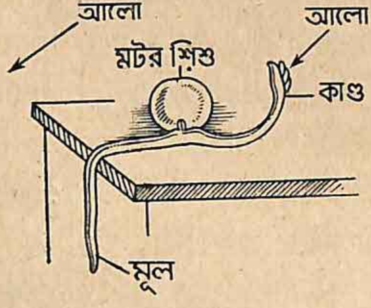
(৪) **উত্তেজনায় সাড়া**—আমাদের চোখ আলোয় সাড়া দেয়, কান শব্দে সাড়া দেয় এবং চামড়া স্পর্শে সাড়া দেয়। আমরা শীত ও তাপ অনুভব করিতে পারি। কেন্নুইকে ছুঁইলে উহা কুণ্ডলী পাকাইয়া যায়। আরশুলার শুঁড়ে হাত দিলে উহা পলাইয়া যায়। প্রাণীমাত্রই এইরূপ কোন-না-কোন উত্তেজনায় সাড়া দেয়।

গাছপালারও উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা আছে। কাণ্ড আলোয় সাড়া দেয় এবং শিকড় অন্ধকারে সাড়া দেয়।

**পরীক্ষা** : কতকগুলি অঙ্কুরিত সরিষা-বীজ একটি টবে করিয়া অন্ধকার ঘরে একটি জানালার নিকট রাখ। দেখ সরিষার গাছ সব



৪৫নং চিত্র



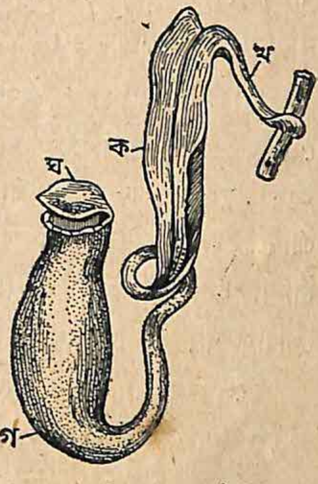

৪৬নং চিত্র

সোজা হইয়া উঠিয়াছে (৪৫নং চিত্র)। জানালাটি খুলিয়া দাও। দুই-তিন দিন পরে দেখিবে, গাছগুলির মাথা জানালার আলোর দিকে ঝুঁকিয়াছে।

**পরীক্ষা** : একটি অঙ্কুরিত মটর-বীজ টেবিলের মাঝখানে করাতের গুঁড়ার মধ্যে রাখ। কয়েক দিন পরে দেখ মটরের শিকড় টেবিলের গা বাহিয়া নীচের দিকে নামিতেছে এবং কাণ্ড বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে ( ৪৬নং চিত্র )।

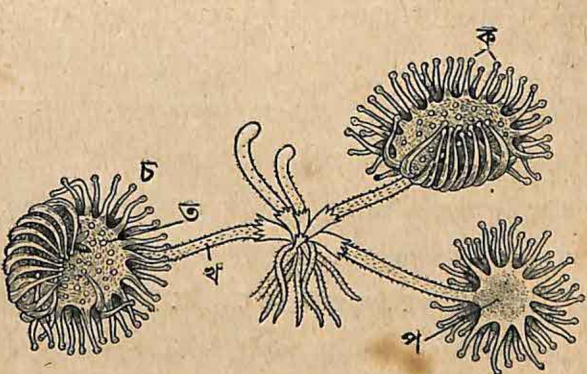
লজ্জাবতীর ছড়ান পাতা স্পর্শ করিলে গুটাইয়া যায়। অনেক উদ্ভিদই পাতা রাত্রে মুড়িয়া ঘুমায়। যথা—কৃষ্ণচূড়া, তেঁতুল ইত্যাদি।

কলস উদ্ভিদের কলসীর মত একটি বস্তু (গ) থাকে। কোন পতঙ্গ ইহার ভিতর ঢুকিলে ইহার ঢাকনা (ঘ) আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া যায়। তাহার ফলে পতঙ্গটি উদ্ভিদের রসে হজম হইয়া যায় (৪৭নং চিত্র)। রৌদ্র শিশির বা ড্রসেরার পাপড়িতে কোন পতঙ্গ বসিলে সঙ্গে সঙ্গে উহা পতঙ্গ সমেত আপনা-আপনি গুটাইয়া আসে (৪৮নং চিত্র)।




৪৭নং চিত্র—কলস উদ্ভিদ

(৫) **জন্ম ও মৃত্যু**—সজীব পদার্থ মাত্রই জন্মায় এবং কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিয়া মরিয়া যায়। মৃত্যুর পর জীবের দেহ জড় পদার্থ হইয়া যায়।




৪৮নং চিত্র—ড্রসেরা

সজীব পদার্থের আয়ুর কোন ঠিক নাই। মানুষ বাঁচে আশি-নব্বুই বৎসর; কোন গাছ এক বৎসর বাঁচে আর কোন গাছ বা হাজার দু'হাজার বৎসরও বাঁচে।

(৬) **বংশ-রক্ষা**—জীবমাত্রেই নানা উপায়ে বংশরক্ষা করে। প্রাণিগণ সন্তান প্রসব করিয়া বা ডিম পাড়িয়া, অধিকাংশ উদ্ভিদ্ বীজ ধারণ করিয়া, কতকগুলি উদ্ভিদ্ পাতা, মুখী, ডাল বা শিকড়ের সাহায্যে বংশরক্ষা করে।

(৭) **চারিদিকের অবস্থার সহিত মানাইয়া চলা**—শীতপ্রধান দেশের প্রাণীর গায়ে প্রচুর লোম থাকে। হিংস্র জন্তুর দাঁত খুব ধারাল; কারণ ইহাদিগকে দাঁত দিয়া মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে হয়। তৃণভোজী প্রাণীর দাঁত ভোঁতা; কারণ ইহাদের ঘাস পেষণ করিতে হয়। চারিদিকের প্রাকৃতিক অবস্থার পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন দেশের মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্য পৃথক পৃথক হইয়াছে।

স্থলের প্রাণী ও উদ্ভিদের গঠন জলের প্রাণী ও উদ্ভিদের গঠন হইতে বিভিন্ন। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে মরিয়া যায়। একটি কুকুর-ছানাকে জলে ডুবাইলে সে দম আট্‌কাইয়া মরিয়া যায়। ব্যাঙাচি লেজ দিয়া জলে সাঁতার দেয়, ফুলকা দিয়া নিঃশ্বাস লয়। পরে যখন ইহা পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হয়, তখন ডাঙ্গায় হাঁটিবার জন্য ইহার পা গজায় ও নিশ্বাস লইবার জন্য ফুস্‌ফুস্ হয়। মরুভূমির প্রাণী উটের পেটে জল জমা করিবার থলি থাকে।

জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড নরম ও ফাঁপা হয়। ইহা সর্বদাই বায়ুপূর্ণ। ইহাদের গায়ে অনেক বায়ুপূর্ণ গর্ত থাকে। ইহাতে জলজ উদ্ভিদ্ সহজে জলে ভাসিতে পারে ও শ্বাস লইতে পারে। জলজ উদ্ভিদের মূল কম থাকে এবং অনেক সময় মূলরোম থাকে না; কারণ ইহা দেহের সকল অংশ দিয়াই জল লয়। মরুভূমিতে জল মাটির অনেক নীচে থাকে বলিয়া মরুভূমির উদ্ভিদের মূল খুব লম্বা হয়। জল জমা করিবার জন্য ইহাদের কাণ্ড ও পাতা পুরু হয়। অল্প জল যাহাতে বাষ্পীভূত হয় সেজন্য পাতা আকারে ছোট ও সংখ্যায় কম হয়।

(৮) **আত্মরক্ষা**—প্রাণিগণ নখ, থাবা, হুল, শিং, হাত, পা, কাঁটা ইত্যাদির সাহায্যে শত্রুর হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া রাখে। বিড়াল নখ দিয়া আঁচড়ায়; ঘোড়া পা দিয়া লাথি মারে; কুকুর দাঁত দিয়া কামড়ায়; গরু, মহিষ শিং দিয়া গুঁতাইয়া দেয়; ভীমরুল ও বোল্‌তা হুল ফুটাইয়া থাকে।

উদ্ভিদের মধ্যে গোলাপ, কুল, বেল, বাবলা প্রভৃতি বড় গাছ তাহাদের **বড় কাঁটা** দিয়া; কাঁটানটে, শিয়ালকাঁটা, কুলেখাড়া প্রভৃতি ছোট গাছ তাহাদের **ঊর্ধ্বমুখী কাঁটা** দিয়া; পুদিনা, গাঁদাল, দ্রোণ ও ধনিয়া তাহাদের **দুর্গন্ধ** দিয়া; নিম, উচ্ছে, নিশিন্দে তাহাদের **বিস্বাদ রস** দিয়া; রাঙচিতা, ধুতুরা, আকন্দ ও ভেরেণ্ডা তাহাদের **বিষাক্ত রস** দিয়া গবাদি পশুর হাত হইতে নিজেদের রক্ষা করে। বিছুটি ও আলকুসী গাছের পাতায় ও কোমল শাখায় **বিষাক্ত রসপূর্ণ** শুঁয়া থাকে। কোন জন্তু ইহাদিগকে স্পর্শ করিবামাত্রই ঐ শুঁয়া জন্তুর দেহে বিদ্ধ হয় এবং শুঁয়ার বিষাক্ত রস তাহার দেহময় ছড়াইয়া পড়ে। কাজেই কোন জন্তুই এই সকল গাছ স্পর্শ করে না। কচু এবং ওল গাছের ভিতরে সূঁচের মত বহু বিষাক্ত দানা আছে। এইগুলি কাঁচা খাইলে মুখ কুট্‌কুট্‌ করে, যন্ত্রণা হয়। আম, জাম, কাঁটাল স্থূল ত্বক দ্বারা শীত ও উত্তাপ হইতে রক্ষা পায়।

পরপৃষ্ঠায় জীব ও জড়ের তুলনা বিশেষভাবে লক্ষ্য কর।

## জীব ও জড়ের তুলনা

| জড় | জীব |
|---|---|
| ১। জড় খাদ্য গ্রহণ, দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি করিতে পারে না। | ১। জীব খাদ্য গ্রহণ, দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি করিতে পারে। |
| ২। জড় পদার্থের নিজের নড়াচড়ার শক্তি নাই। | ২। সকল প্রাণীই চলিতে পারে। উদ্ভিদ্‌ও নড়াচড়া করে। |
| ৩। জড় উত্তেজনায় সাড়া দেয় না। | ৩। জীব উত্তেজনায় সাড়া দেয়। |
| ৪। জড়ের শ্বাসকার্য বলিয়া কিছু নাই। | ৪। জীবের শ্বাসকার্য আছে। |
| ৫। জড় বংশ বৃদ্ধি করে না। | ৫। জীব বংশ বৃদ্ধি করে। |
| ৬। জড়ের জন্ম ও মৃত্যু নাই। | ৬। জীবের জন্ম ও মৃত্যু আছে। |
| ৭। জড় আত্মরক্ষা করিতে পারে না। | ৭। জীব আত্মরক্ষা করিতে পারে। |

## (খ) উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর পার্থক্য

(১) উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর দেহ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ (cell) দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক কোষের মধ্যস্থলে নিউক্লিয়াস নামক পদার্থ ও নিউক্লিয়াসকে ঘিরিয়া প্রোটোপ্লাজম নামক পদার্থ আছে। অতি ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর দেহে একটিমাত্র কোষ থাকে। প্রাণীর দেহকোষের চারিধারে কোষপ্রাচীর নাই। উদ্ভিদের দেহকোষের এইরূপ প্রাচীর আছে।

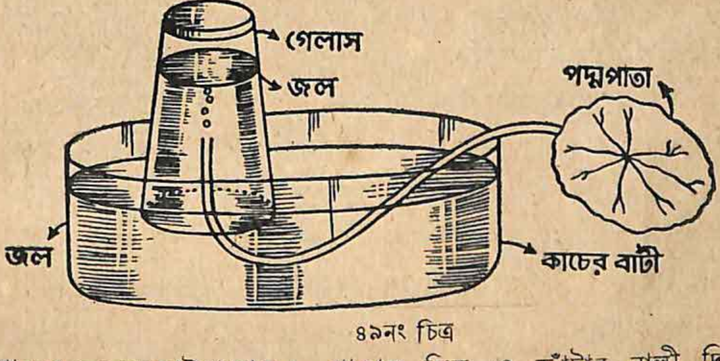
(২) উদ্ভিদের দেহে সবুজ কণা আছে। প্রাণীর দেহে সাধারণত সবুজ কণা নাই। উদ্ভিদের সবুজ অংশ সূর্যের আলোর সাহায্যে খাদ্য

প্রস্তুত করে। কিন্তু প্রাণী হয় উদ্ভিদ্-জাত খাদ্য গ্রহণ করে, না হয় উদ্ভিদ্ভোজী পশুর মাংস খায়। বাঘ ছাগলের মাংস খায়; আবার ছাগল তৃণ খায়। প্রাণী খাদ্য হজম করিতে পারে কিন্তু খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না।

(৩) প্রায় সকল প্রাণীই মুখ দিয়া আহার করে। উদ্ভিদের মুখ নাই; ইহারা শিকড় দিয়া মাটি হইতে এবং সবুজ অংশ দিয়া সূর্যের আলোর সাহায্যে বাতাস হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। উদ্ভিদ্ কখনও কঠিন খাদ্য গ্রহণ করে না, কেবল তরল খাদ্য গ্রহণ করে। প্রাণী তরল ও কঠিন উভয় প্রকার খাদ্যই খাইতে পারে।

(৪) অধিকাংশ প্রাণী নাক ও ফুস্ফুস্ দিয়া বাতাস লয়। উদ্ভিদ্ সারা দেহের সাহায্যে বিশেষত পাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া বাতাস লয়।

**পরীক্ষা**ঃ একটি জলপূর্ণ বড় পাত্রে একটি জলপূর্ণ গ্লাস উপুড় করিয়া রাখ। একটি ডাঁটাযুক্ত পদ্মপাতা লইয়া ডাঁটার শেষ অংশ




৪৯নং চিত্র

গ্লাসের জলে ঢুকাইয়া দাও। পাতার ছিদ্র ও ডাঁটার নালী দিয়া বাহিরের বাতাস গ্লাসে জমে; জল নীচে নামিয়া যায়। পাতাটি জলের মধ্যে ডুবাইলে পাতার ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায়। বায়ু পাতার মধ্যে আর ঢুকিতে পারে না।

(৫) উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি ও নূতন পত্র ধারণ সারাজীবন ধরিয়া চলে। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি গাছ অতি শীঘ্রই বাড়ে। পেঁপে ও কদম গাছও শীঘ্র বাড়ে; কিন্তু আম, তাল, নারিকেল গাছ ধীরে ধীরে বাড়ে। জাপানে এক রকম গাছ আছে তাহা এক শত বৎসরেও এক ফুট উচ্চ হয় না। প্রাণীদের দৈহিক বৃদ্ধি কিছুদিন হইয়া পরে বন্ধ হইয়া যায়।

(৬) উদ্ভিদ্ সাধারণত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায় না, প্রাণী সহজেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে।

(৭) উদ্ভিদের দেহের সামঞ্জস্য নাই, প্রাণীর দেহের সামঞ্জস্য আছে।

## উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর তুলনা

| প্রাণী | উদ্ভিদ্ |
|---|---|
| ১। দেহকোষে প্রাচীর নাই। | ১। দেহকোষে প্রাচীর আছে। |
| ২। জন্ম, আহার-গ্রহণ, দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি এবং মৃত্যু আছে। | ২। জন্ম, আহার-গ্রহণ, দেহপুষ্টি ও বৃদ্ধি এবং মৃত্যু আছে। |
| ৩। মুখ দিয়া তরল ও কঠিন পদার্থ আহার করে। | ৩। শিকড় ও পাতা দিয়া যথাক্রমে তরল পদার্থ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড আহার করে। |
| ৪। বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে অঙ্গার গ্রহণ করিতে পারে না। | ৪। বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে অঙ্গার গ্রহণ করিতে পারে। |
| ৫। আহার্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে না। | ৫। সবুজ উদ্ভিদ্ আহার্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। |
| ৬। শ্বাসকার্য চলায়। | ৬। শ্বাসকার্য চলায়। |
| ৭। চলিতে ও নড়িতে পারে। | ৭। কেবল নাড়তে পারে। |

## (গ) উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ

উদ্ভিদ প্রধানত দুই প্রকারের। যথা—**সপুষ্পক ও অপুষ্পক**।

গোলাপ, জবা, যূঁই, আম, জাম, লিচু, লাউ এবং কুমড়ার গাছে ফুল, ফল ও বীজ হয়। এই সকল গাছকে **সপুষ্পক** বা **সজীব গাছ** বলে।

শ্যাওলা, মস, ফার্ন, ব্যাঙের ছাতা প্রভৃতির কখনও ফুল, ফল বা বীজ হয় না। ইহাদিগকে **অপুষ্পক** বা **অবীজ উদ্ভিদ্** বলে।

পচা গোবর কিংবা পচা গাছপালার উপরে অনেক সময় সাদা **ব্যাঙের ছাতা** দেখা যায়। পুকুর, বিল বা চৌবাচ্চায় সবুজ পিচ্ছিল



৫০নং চিত্র—ফার্ণ ও মস



৫১নং চিত্র—ব্যাঙের ছাতা

**শ্যাওলা** দেখা যায়। ব্যাঙের ছাতা ও শ্যাওলা উদ্ভিদের কিন্তু শিকড়, কাণ্ড বা পাতা নাই। ইহারা এক শ্রেণীর অপুষ্পক উদ্ভিদ্। ভিজা দেওয়ালের গায়ে ঘন সবুজ বর্ণের মস নামক একপ্রকার উদ্ভিদ জন্মায়।

ইহাদের কাণ্ড ও পাতা থাকে কিন্তু মূল থাকে না। ইহারাও এক শ্রেণীর অপুষ্পক উদ্ভিদ্।

ভিজা জায়গায় নানা রকম পাতাযুক্ত গাছ দেখা যায়। ইহাদিগকে **ফার্ণ** বলে। ইহাদের কাণ্ড, পাতা ও মূল হয়। শুশ্‌নির শাক এক প্রকার ফার্ণ। ইহারা এক শ্রেণীর অপুষ্পক উদ্ভিদ্।

সপুষ্পক গাছের মধ্যে যাহাদের বীজ ফলের মধ্যে থাকে, তাহাদিগকে **আবৃত-বীজ** বলে। যথা—আম, জাম, লিচু ইত্যাদি। যাহাদের বীজ পাতার উপর অনাবৃতভাবে থাকে, তাহাদিগকে **নগ্নবীজ** বলে। যথা—পাইন।

আবার আবৃত-বীজ উদ্ভিদ্ দুই প্রকারের হয়। যে সকল উদ্ভিদের বীজে একটিমাত্র বীজপত্র থাকে, তাহাদিগকে **একবীজপত্রী উদ্ভিদ্** বলে। যথা—ধান, গম, যব। যে সকল উদ্ভিদের বীজে দুইটিমাত্র বীজপত্র থাকে, তাহাদিগকে **দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ্** বলে। যথা—ছোলা, মটর ইত্যাদি।

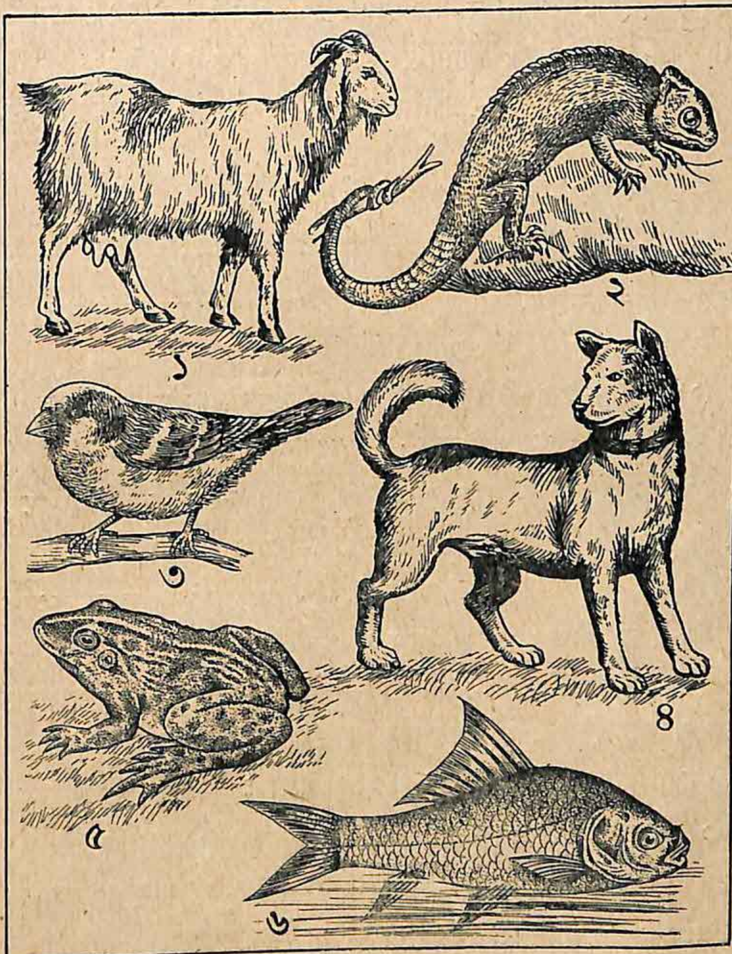
### (ঘ) প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ

প্রাণীকে প্রধানত **দুইটি শ্রেণীতে** ভাগ করা হয় ঃ—

(১) **এককোষী** বা একটিমাত্র কোষযুক্ত দেহ ; যথা—অ্যামিবা। ইহারা আমাদের দেহে রোগ উৎপন্ন করে। ইহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া বংশ বৃদ্ধি করে। (২) **বহুকোষী** বা বহুকোষযুক্ত দেহ ; যথা,—মানুষ, গরু, কীট, পতঙ্গ, পাখী প্রভৃতি।

প্রাণীকে আবার **দুই শ্রেণীতেও** ভাগ করা যায়। যথা ঃ—

(১) **মেরুদণ্ডী** বা যাহাদের দেহে কোন অস্থিমালা বা মেরুদণ্ড আছে। মানুষ, কুকুর, বিড়াল, মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণী মেরুদণ্ডী প্রাণীর অন্তর্গত। মাছ খাইবার সময় মাছের যে কাঁটা দেখিতে পাও, উহা মাছের হাড়।




৫২নং চিত্র—মেরুদণ্ডী প্রাণী

১। ছাগল, ২। গিরগিটি, ৩। পাখী, ৪। কুকুর, ৫। ব্যাঙ, ৬। মাছ

(২) **অমেরুদণ্ডী** বা যাহাদের দেহে কোন হাড় নাই। যেমন— চিংড়ি, পিপীলিকা, মশা, মৌমাছি, কেঁচো, প্রজাপতি ইত্যাদি।

মেরুদণ্ডী আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—(১) **করোটিযুক্ত** ও (২) **করোটিবিহীন**।

**করোটিযুক্ত মেরুদণ্ডী পাঁচ পর্বে** বিভক্ত। যথাঃ—

(১) **স্তন্যপায়ী**—ইহারা একেবারে বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চা মাতৃস্তন্য পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহাদের দেহে লোম থাকে। যথা—মানুষ, গরু, তিমি প্রভৃতি।

(২) **পক্ষী**—ইহারা ডিম প্রসব করে, ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। ইহাদের দেহ পালক দ্বারা আবৃত ; দেহে ডানা আছে।

(৩) **সরীসৃপ**—ইহারা বুকে ভর দিয়া চলে ও ডিম পাড়ে ইহাদের দেহ আঁইশ দ্বারা আবৃত। যথা—কচ্ছপ, সাপ, টিকটিকি।

(৪) **উভচর**—ইহারা জলে-স্থলে উভয় স্থানেই বাস করে। ইহারাও ডিম পাড়ে। যথা – ব্যাঙ।

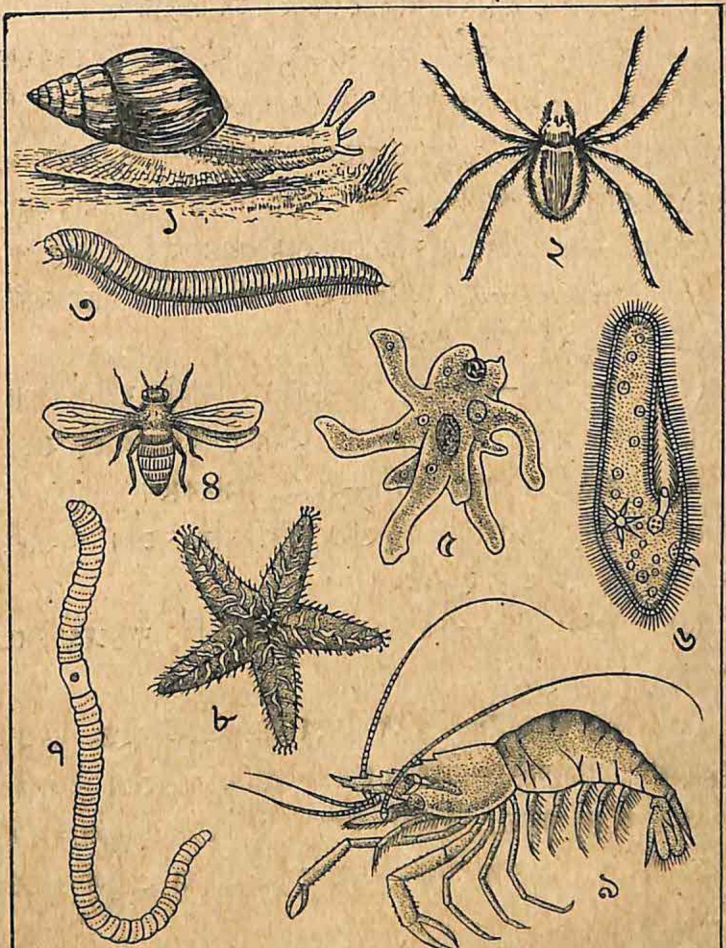
(৫) **মৎস্য**—ইহারা জলে বাস করে, জোড়া পাখনার সাহায্যে জলে সাঁতার দেয় এবং ডিম পাড়ে।

**করোটিহীন মেরুদণ্ডী তিন প্রকার। যথা** ঃ—

(১) **ব্যালানো গ্লসাস**—দেখিতে কেঁচো রমত। (২) **অ্যাম্ফিওক্সাস**—দেখিতে মাছের মত। (৩) **অ্যাসিডিয়ানস্**—সকলেই সামুদ্রিক প্রাণী।

**অমেরুদণ্ডী নয় পর্বে বিভক্ত। যথা** ঃ—

(১) **শম্বুক**—ইহারা সর্বোচ্চ স্তরের অমেরুদণ্ডী জীব। ইহাদের কোমল দেহের উপর চূণময় পুরু খোলা থাকে। শামুক, ঝিনুক, কড়ি, শাঁখ, গেঁড়ি এই জাতীয় প্রাণী। ইহারা আমাদের অনেক কাজে লাগে। আমরা শামুক ও ঝিনুকের মাংস খাই ; শাঁখ বাজাই ; শাঁখের খোলা হইতে শাঁখা ও চুড়ি, ঝিনুকের খোলা হইতে বোতাম




৫৩নং চিত্র—অমেরুদণ্ডী প্রাণী

১। স্থল-শামুক, ২। মাকড়সা, ৩। কেন্নুই, ৪। মৌমাছি, ৫। অ্যামিবা, ৬। প্যারামাসিয়া, ৭। কেঁচো, ৮। তারামাছ, ৯। চিংড়িমাছ।

ও অন্যান্য সৌখিন জিনিষ তৈয়ার করি। ঝিনুকের পেট হইতে মুক্তা পাই। ঝিনুকের ও শাঁখের খোলা পোড়াইয়া চূণ তৈয়ার করি।

(২) **সন্ধিপদ**—ইহাদের পদ সন্ধি দ্বারা আবদ্ধ। দেহ কয়েক খণ্ডে বিভক্ত, প্রত্যেক খণ্ডে দুইটি উপাঙ্গ থাকে। ইহাদের চারিটি প্রধান শ্রেণী আছে। যথা, (ক) **পতঙ্গ** বা **ষট্‌পদী**—যথা, মৌমাছি, মশা; (খ) **বহুপদী**—যথা, বিছা, কেন্নুই; (গ) **মাকড়**—যথা, মাকড়সা; (ঘ) **খোলকী**—যথা, চিংড়ী। সন্ধিপদের দেহ কঠিন আবরণে আবৃত।

(৩) **কণ্টক-ত্বক্**—যথা, তারামাছ। অধিকাংশের গায়ে কাঁটা থাকে। ইহারা সমুদ্রবাসী ও মন্থরগামী।

(৪) **অঙ্গুরীমাল**—ইহাদের দেহ লম্বা এবং আংটির মত পরস্পর সংলগ্ন খণ্ড দিয়া গঠিত। যথা, কেঁচো, জোঁক। ইহাদের ত্বক্ স্বচ্ছ।

(৫) **গোল ও লম্বা কৃমি**—ইহারা অধিকাংশ আমাদের বৃহদন্ত্রে বাস করে; আবার কতকগুলি জলে বাস করে। ইহাদের মুখ, পৌষ্টিক নালী ও পায়ু আছে।

(৬) **চ্যাপ্টা কৃমি**—পশুর যকৃতে যকৃৎ-কৃমি, মানুষের অন্ত্রে ফিতা-কৃমি উহার দৃষ্টান্ত।

(৭) **একছিদ্রদেহী**—ইহাদের দেহে মাত্র একটি ছিদ্র আছে। ইহারা তাহা দিয়া আহার গ্রহণ ও দূষিত পদার্থ ত্যাগ করে। ইহাদের অনেকের শুঁড় আছে। ইহারা জলচর প্রাণী। যথা—জেলিফিস, হাইড্রা, প্রবাল। প্রবাল কীটের দেহাবশেষ জমিয়া প্রবাল দ্বীপের সৃষ্টি হয়।

(৮) **বহুছিদ্রদেহী**—ইহারা দেহস্থ বহু ছিদ্র দিয়া আহার গ্রহণ করে ও দূষিত পদার্থ ত্যাগ করে। ইহারা সমুদ্রবাসী প্রাণী। যথা—স্পঞ্জ। ইহারা আমাদের অনেক উপকারে আসে।

(৯) **এক-কোষ প্রাণী**—অ্যামিবা।

২। **মটর গাছের বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের কার্য পর্যবেক্ষণ** ( Observations of the different parts of a pea plant ) : তোমরা মটরশুঁটি খাইতে খুব ভালবাস। মটরশুঁটি হইল মটর গাছের ফল। শুঁটির ভিতর বীজ সাজান থাকে। মটরের ফল হইতে আমরা মটরডাল পাই। আমাদের দেশে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে মটর বীজ বোনা হয় এবং চৈত্র মাসে ফসল কাটা হয়।

**মূল**—আলগা মাটি বা কাঠের গুঁড়াপূর্ণ একটি মাটির সরা লও। উহাতে কয়েকটি ভিজা মটর বীজ পুঁতিয়া রাখ এবং পরিমিত জল দাও। কয়েকদিন পরে দেখিবে প্রত্যেক বীজ ফাটিয়া নীচের দিকে **ভাবী মূল** বাহির হইয়াছে। ইহা মাটির ভিতর প্রবেশ করে এবং ক্রমশ বড় হইয়া **প্রধান মূলে** পরিণত হয়। ইহার গা হইতে ছোট ছোট **শাখামূল** বাহির হয়। ইতিমধ্যে বীজ হইতে **ভাবী কাণ্ড** বাহির হয় এবং পরে ইহা হইতে **প্রধান কাণ্ড ও পাতা** বাহির হয়।

বাগান হইতে একটি মটর গাছ তুলিয়া মূলগুলি পরীক্ষা কর। দেখ প্রত্যেক মূলের আগায় একটি টুপির মত ঢাক্না থাকে; ইহাকে **মূলত্রাণ** বলে। মূলত্রাণের ঠিক উপরেই খানিকটা জায়গায় ছোট ছোট রোঁয়া থাকে; ইহাদিগকে **মূলরোম** বলে।

**মূলের কার্য**—(১) মূল মাটির মধ্যে গাছকে দৃঢ়ভাবে আট্কাইয়া রাখে। মটর গাছ বড় হইলে মাটি হইতে উপড়াইয়া তুলিতে জোর লাগে। (২) মূল মাটি হইতে মূলরোমের সাহায্যে তরল খাদ্য সংগ্রহ করে। মূলরোম হইতে একপ্রকার অম্লরস বাহির হইয়া কতকগুলি খাদ্যকে মাটির জলে দ্রবীভূত করে। (৩) মূলত্রাণ আছে বলিয়া মূল মাটির ভিতর বাড়িবার সময় কোনও আঘাত পায় না। (৪) মটরের মূলে এক প্রকার গুটি থাকে। এই গুটির মধ্যে জীবাণু বাস করে এবং মাটির বায়ু হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে।

**কাণ্ড**—মটর গাছের কাণ্ড সবুজ রংঙের, গোলাকার, নরম ও ফাঁপা। কাণ্ডের যে অংশ হইতে পাতা বাহির হয় তাহাকে **গাঁইট** বলে। দুইটি গাঁইটের মধ্যবর্তী অংশকে **পাব** বলে। পাতা ও গাঁইটের সংযোগ-স্থলকে **কক্ষ** বলে। প্রত্যেক কক্ষে এবং কাণ্ডের আগাতে **মুকুল** বা কুঁড়ি হয়। কক্ষের মুকুলের বৃদ্ধিতে ডালপালা হয় এবং মাথার মুকুলের বৃদ্ধিতে কাণ্ড বড় হয়। মটর গাছের কাণ্ড খুব দুর্বল। সেইজন্য গাছ সোজাভাবে দাঁড়াইতে পারে না। ইহা **লতানে** গাছ। ইহাদের শাখা রূপান্তরিত হইয়া সূতার মত হয়; ইহাকে **আকর্ষ** বলে। আকর্ষের সাহায্যে মটর গাছ কোন কিছু জড়াইয়া উপরে উঠে।




৫৪নং চিত্র—
মটর গাছের বিভিন্ন অংশ

**কাণ্ডের কার্য**—(১) কাণ্ড পাতা, ফুল ও ফল ধারণ করে এবং পত্রগুলিকে যথাসম্ভব সূর্যের আলোর দিকে ঘুরাইয়া রাখে। (২) মূল মাটি হইতে যে রস সংগ্রহ করে কাণ্ডের মধ্যস্থিত নালী দিয়া তাহা পাতায় পৌঁছায়। (৩) পাতায় প্রস্তুত খাদ্য আবার অপর এক প্রকার নালী দিয়া উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে চালিত হয়। (৪) কাণ্ডের সবুজ অংশ সূর্যালোক হইতে অঙ্গার আত্মকরণ করে।

**পাতা**—মটর গাছের প্রত্যেক পাতার তিনটি অংশ আছে। যথা—**পত্রমূল** বা **গোড়া**, **বৃন্ত** বা **বোঁটা** ও **ফলক**। এই পাতার বোঁটায় দুইটি ফলক আছে। ইহাকে **যৌগিক** পত্র বলে। দুইটি ফলক পালকের মত কক্ষের দুই পাশে সাজান থাকে। ইহার পাতায় জালের

মত শিরা আছে। প্রত্যেক পাতার গোড়ায় দুইটি বড় উপপত্র এবং কয়েক জোড়া অনুফলক আছে। পাতার শেষে আকর্ষ আছে। পাতা গাছের যত কাজ করে, অন্য কোন অংশ তত কাজ করে না। যথা :—

(১) **খাবার গ্রহণ :** গাছের দুইটি মুখ—একটি মূল, অপরটি পাতা। পাতা বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড খায়।

(২) **খাবার প্রস্তুত :** পাতার সবুজ কণা সূর্যের আলোর সাহায্যে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে কার্বন গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়, তাহা তোমাদিগকে পূর্বে বলা হইয়াছে।

(৩) **শ্বাসকার্য :** মটর গাছের পাতা নাকের কাজ করে। মটর গাছ পাতার ছিদ্র দিয়া বায়ু গ্রহণ করে। বায়ুর অক্সিজেনের সহিত কোষের মধ্যস্থিত সঞ্চিত খাদ্যের মৃদু দহন কার্য হয়। ইহাতে উদ্ভিদ্-দেহে তাপের উদ্ভব হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। এই সকল পদার্থ পাতার ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। উদ্ভিদের শ্বাসকার্য দিবারাত্র চলে। শ্বাসকার্যে যে তাপের ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের উদ্ভব হয়, তাহা ১০ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে।

(৪) **প্রস্বেদন** বা **ঘাম নির্গমন :** উদ্ভিদ্ মাটি হইতে কেবল তরল খাদ্য গ্রহণ করে। সুতরাং উদ্ভিদ্‌কে অনেক জল গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এত জল উদ্ভিদের দরকার হয় না বলিয়া উদ্ভিদ্ প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল পাতার ছিদ্র দিয়া বাষ্পাকারে বাহির করিয়া দেয়। এই প্রক্রিয়াকে **প্রস্বেদন** বলে। প্রস্বেদন ক্রিয়া কেবল দিনের বেলায় চলে।

**পরীক্ষা :** একটি কাচের গ্লাস জলে অর্ধেক ভর্তি কর। একটি পাতাযুক্ত ডালের কাটা অংশ জলে ডুবাইয়া রাখ। ধীরে ধীরে জলের উপর তেল ঢালিয়া দাও। তেলের জন্য জল হইতে বাষ্পীভবন হইবে

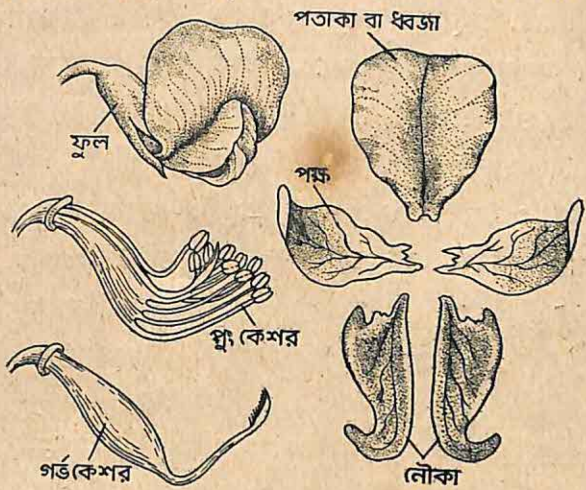
না। একটি বড় বেলজার দিয়া ডালসমেত গ্লাসটিকে ঢাকিয়া দাও। ২৪ ঘণ্টার ভিতর বেলজারের ভিতর গায়ে জলবিন্দু দেখিবে। পাতা হইতে প্রস্বেদনের ফলে জলীয় বাষ্প বাহির হইয়া শীতল কাচের সংস্পর্শে জল বিন্দুরূপে জমিয়াছে।



৫৫নং চিত্র—উদ্ভিদের প্রস্বেদন

**মটরের ফুল ও তাহার কাজ**ঃ গাছের জন্ম হইতে প্রায় এক মাসের মধ্যে ফুল ফোটে। ফোটা ফুল দেখিতে অনেকটা প্রজাপতির মত। ফুলের সবচেয়ে বাহিরের অংশ বা **বৃতি** সবুজ রঙের ও বাটির মত। বৃতির ভিতরের স্তবক বা **দল** সাধারণত নীল রঙের হয়। দলের অংশকে **পাপ্‌ড়ি** বলে। দলে পাঁচটি অসমান পাপ্‌ড়ি থাকে। সকলের বড় পাপ্‌ড়িকে **পতাকা** বলে। ইহার দুই পাশে দুইটি ডানার মত পাপ্‌ড়িকে **পক্ষ** বলে। পক্ষের ভিতরকার দুইটি পাপ্‌ড়ি সামান্য জোড়া থাকে। ইহাদিগকে **নৌকা** বলে। ফুলের তৃতীয় স্তবককে **পুংকেশর** বলে। মটর ফুলে নৌকার ভিতর দশটি পুংকেশর আছে। ইহাদের মধ্যে নয়টির সূত্র মিলিয়া একটি নলের মত হইয়াছে; দশমটি সম্পূর্ণ পৃথক। ফুলের চতুর্থ স্তবককে **গর্ভকেশর** বলে। মটর ফুলে একটিমাত্র **গর্ভকেশর** আছে। গর্ভকেশরের নীচের ফোলা অংশ বা **গর্ভকোষ** লম্বা, মাঝের সরু অংশ বা **গর্ভদণ্ড** খুব ছোট এবং উপরের গোল অংশ বা **গর্ভমুণ্ড** আঠাল। পুংকেশরের উপরের অংশকে **পরাগকোষ** বলে। গর্ভকোষের ভিতর ডিম্বকোষ ও স্ত্রীজনন কোষ

থাকে। পুংকেশর পুষ্ট হইলে পরাগকোষ ফাটিয়া পরাগ বাহির হয়। ফুলের সুন্দর পাপ্‌ড়ি ও মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মৌমাছিরা ফুলে




৫৬নং চিত্র—মটর ফুলের বিভিন্ন অংশ

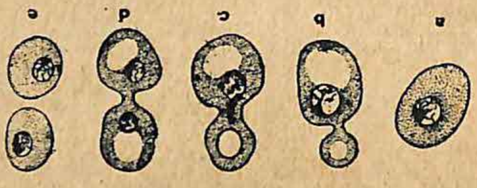
বসে। ইহাদের পায়ে গায়ে পরাগ লাগিয়া যায়। এই মৌমাছির অন্য ফুলে বসিলে পরাগকোষ গর্ভমুণ্ডের আঠায় আট্‌কাইয়া যায়। স্ত্রীজনন কোষ পুংজনন কোষ দ্বারা নিষিক্ত হইলে গর্ভকোষটি ফলে এবং ডিম্বকোষটি বীজে পরিণত হয়। বীজ হইতে গাছের নূতন চারা হয়। এইরূপে গাছের বংশবৃদ্ধি হয়।

৩। **সরল উদ্ভিদ্ ও প্রাণী**ঃ লাউ-কুমড়ার কচি ডাঁটা জলে একটু গরম করিলে কতক অংশ কাদার মত এবং কতক অংশ সূতার মত দেখিবে। কাদার মত পদার্থকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিলে অনেকগুলি **কোষ** দেখিতে পাইবে। পর পর ইট সাজাইয়া যেমন ঘর প্রস্তুত হয়, তেমনই কোষ সাজাইয়া উদ্ভিদের দেহ গঠিত হয়।

প্রাণীর দেহও এইরূপ কোষ দ্বারা গঠিত। তবে প্রাণীর কোষ ও উদ্ভিদের কোষে পার্থক্য আছে। পরে ইহা জানিবে।

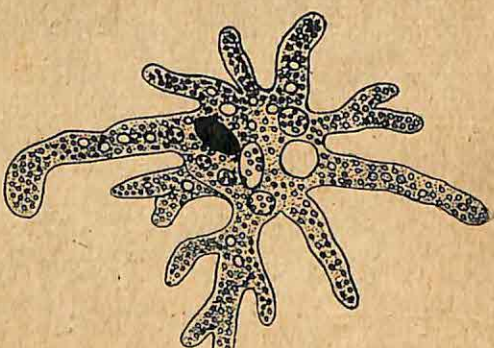
**ঈস্ট** ঃ ইহারা এক-কোষযুক্ত উদ্ভিদ্। ইহারা অন্যান্য উদ্ভিদের ন্যায় শ্বাসকার্য চালান, আহার গ্রহণ করিয়া দেহ পুষ্ট করা, বিষাক্ত দ্রব্য ত্যাগ করা প্রভৃতি জীবের সকল কার্যই করে। ইহারা নিজেদের দেহ ভাগ করিয়া বংশ বিস্তার করে। ঈস্ট আমাদের নানা উপকারে লাগে। ইহার প্রভাবে তালের রস গাঁজিয়া যায়, চিনির রস সুরায় পরিণত হয় এবং পাউরুটি ফুলিয়া উঠে।

**অ্যামিবা** ঃ ইহারা এক-কোষযুক্ত প্রাণী। ইহারা শ্বাসকার্য চালায়, আহার গ্রহণ করিয়া দেহ পুষ্ট করে, বিষাক্ত দ্রব্য ত্যাগ করে।



৫৭নং চিত্র—অ্যামিবার বংশবৃদ্ধি

অ্যামিবার গতিশক্তি অণুবীক্ষণে দেখা যায়। ইহারা দেহের বিভিন্ন অংশ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিয়া স্থানান্তরে যাতায়াত করে। এই সঞ্চরণের ক্ষমতা নানারূপ দ্রব্য প্রয়োগে বাড়ান বা কমান যায়। অ্যামিবা নিজ দেহ ভাগ করিয়া বংশ বৃদ্ধি করে। ইহা আমাদের পৌষ্টিক নালীতে প্রবেশ করিলে আমাশয় হয়।



৫৮নং চিত্র—অ্যামিবা

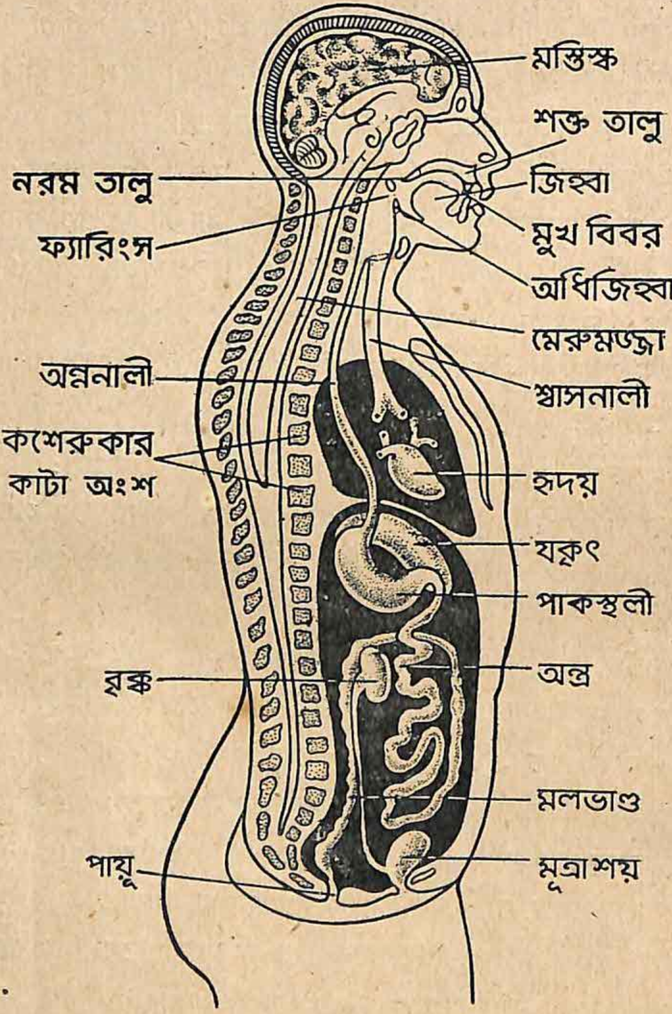
**মস** ঃ মস এক প্রকার উদ্ভিদ্। ইহাদের ফুল বা ফল হয় না। ইহাদের কাণ্ড ও পাতা আছে কিন্তু মূল নাই, কাণ্ড খুব সরু। পাতার গুঁড়া হইতে ইহারা বংশবৃদ্ধি করে (৫০নং চিত্র)।

৪। (১) **মানবদেহের সাধারণ গঠন** ঃ আমাদের দেহে শক্ত অস্থির কাঠামোর উপর কোমল মাংশপেশী, মেদ ও সর্বোপরি ত্বক্ থাকে। অস্থির কাঠামোকে **কঙ্কাল** (Skeleton) বলে। আমাদের শরীরে ছোট-বড় সর্বসমেত ২০৬টি অস্থি আছে।

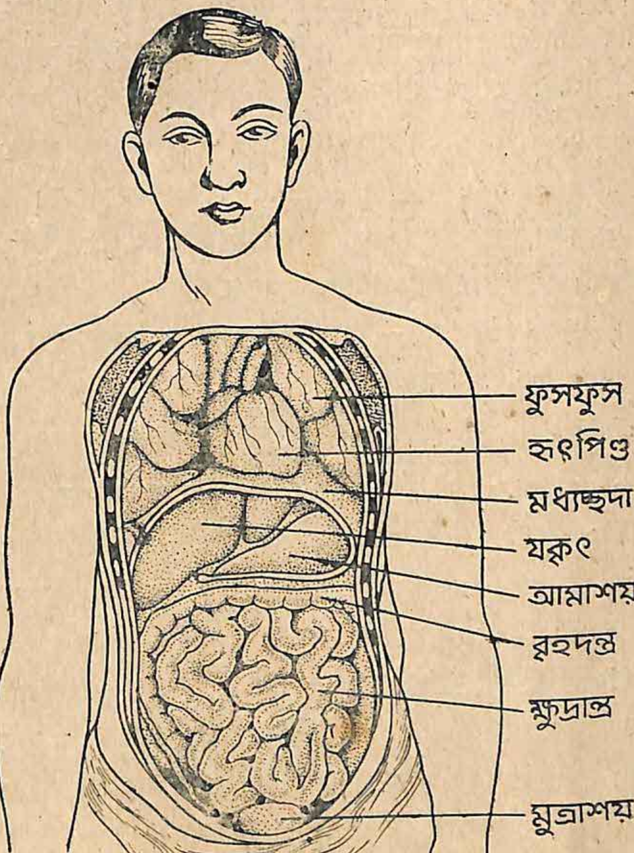
মানবদেহে চারিটি প্রধান অংশ আছে; যথা—**(ক) মস্তক** ঃ এই অংশ **খুলি ও মুখমণ্ডল** লইয়া গঠিত। খুলি আটখানি চওড়া ও চ্যাপ্টা অস্থির দ্বারা গঠিত একটি প্রকোষ্ঠ। খুলির ভিতর আমাদের দেহের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ ও জটিল অংশ মস্তিষ্ক বা **মগজ** সুরক্ষিত থাকে। মগজই আমাদের বুদ্ধি, চিন্তা প্রভৃতি যোগায় ও আমাদের কার্যাদি নিয়ন্ত্রিত করে।

মস্তকের সম্মুখের দিকের অংশের নাম **মুখমণ্ডল**; ইহাতে চৌদ্দখানি অস্থি আছে। ইহাতে **চোয়াল, কপাল ও গণ্ডদেশ** আছে। মস্তকে **চক্ষু, কর্ণ** ও **নাসিকা**—এই তিনটি প্রধান অঙ্গ অবস্থিত।

নাসিকার নীচে **মুখগহ্বর**। মুখ এবং নাসারন্ধ্র এই গহ্বরের দ্বার-স্বরূপ। মুখের মধ্যে দুই পাটিতে মোট ২৮ হইতে ৩২টি দাঁত থাকে। মুখ-গহ্বরের পশ্চাৎ দিকের নিম্ন অংশকে **ফ্যারিংস** বলে। ফ্যারিংসের সম্মুখ হইতে **জিহ্বা** দন্তপাটি পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। এই জিহ্বা প্রয়োজনানুসারে নড়াচড়া করিতে পারে। ফ্যারিংস হইতে নীচের দিকে ধড়ের মধ্যে দুইটি নালী পৃথকভাবে চলিয়া গিয়াছে। সম্মুখের নালীকে **শ্বাসনালী** ও পশ্চাতের নালীকে **অন্ননালী** বলে। নাসারন্ধ্র ও শ্বাসনালী দিয়া বায়ু ফুস্ফুসে যায় এবং মুখ ও অন্ননালী দিয়া আহার্য দ্রব্য আমাশয়ের ভিতরে যায়। মুখ-গহ্বরের কঠিন উপরিভাগকে শক্ত **তালু** বলে। ইহার পিছনের কোমল অংশকে **নরম তালু** বলে। ইহা ক্রমে **আলজিহ্বায়** ( ৬২নং চিত্র ) শেষ হইয়া যায়। এই




৫৯নং চিত্র—দেহের বিভিন্ন যন্ত্র (পার্শ্ব হইতে)



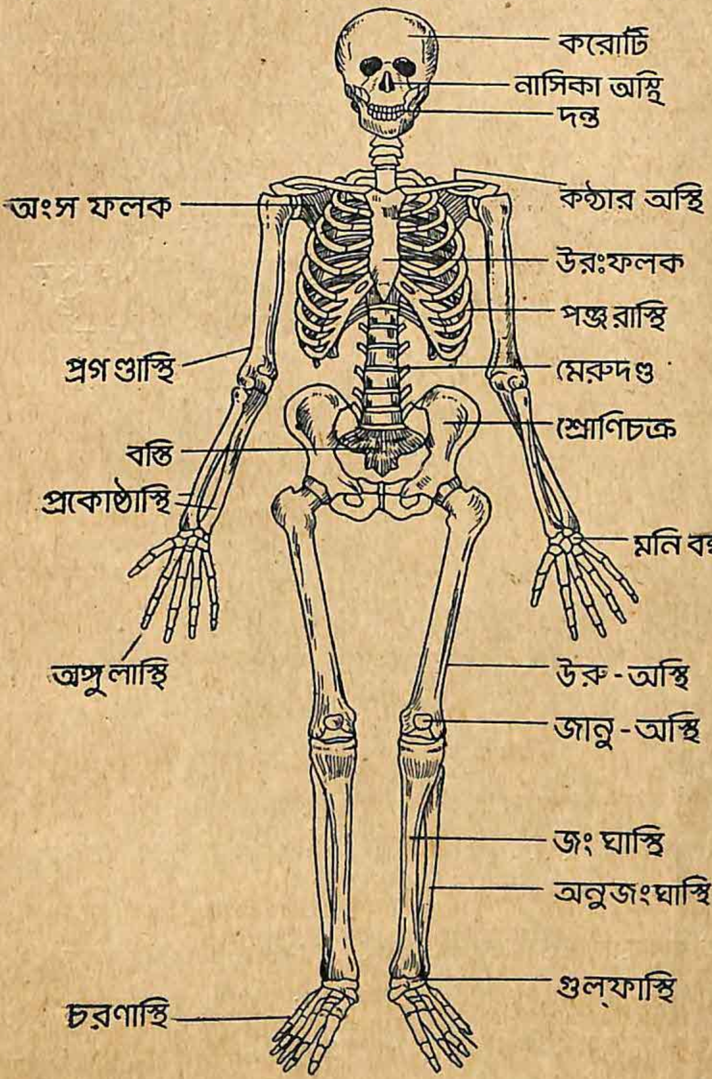

৬০নং চিত্র—দেহের বিভিন্ন যন্ত্র ( সম্মুখ হইতে )

আলজিহ্বা ফ্যারিংসকে নাসারন্ধ্রের ভিতর-মুখ হইতে পৃথক করে। জিহ্বার গোড়ায় শ্বাসনালীর উপরে অবস্থিত একটি ঢাক্না আছে। ইহাকে **অধিজিহ্বা** বলে। খাইবার সময় আলজিহ্বা নাসারন্ধ্রের ছিদ্রকে এবং অধিজিহ্বা শ্বাসনালীকে এমনভাবে বন্ধ করিয়া দেয় যে, আহার্য দ্রব্য ঐ দুই পথে প্রবেশ করিতে পারে না। অনেক সময় তাড়াতাড়িতে খাইবার সময় খাদ্যকণা শ্বাসনালীতে ঢুকিয়া বড় কষ্ট দেয়। ইহাকেই আমরা **বিষম লাগা** বলি।

(খ) **দেহকাণ্ড বা ধড়**—ইহা তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা—উপরে **গ্রীবা**, মধ্যে **বক্ষ** ও নিম্নে **উদর**।

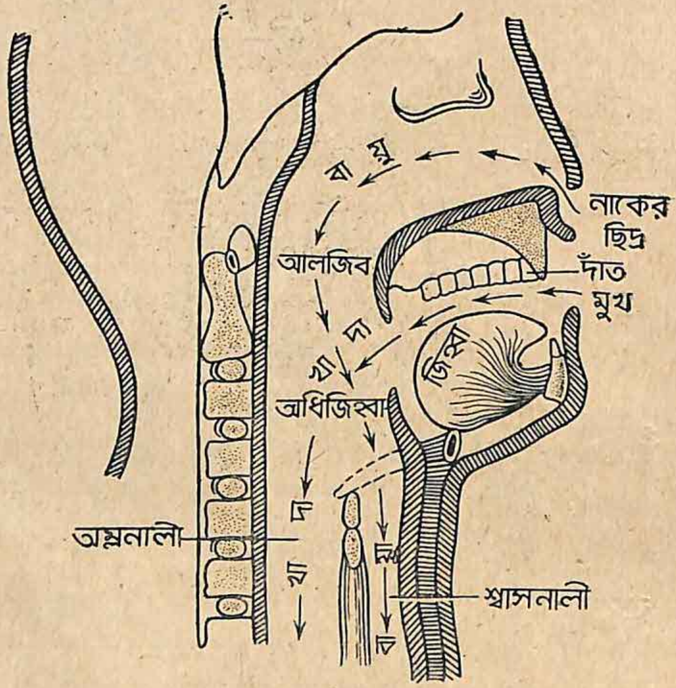
ধড়ের প্রধান কাঠামো **মেরুদণ্ড** প্রায় ২৮ ইঞ্চি দীর্ঘ। ইহা ৩৩টি অস্থিখণ্ড বা **কশেরুকা** দ্বারা গঠিত। এই সকল কশেরুকার মধ্যে **গ্রীবায়** সাতখানি, **পৃষ্ঠে** বারখানি ও **কটিতে** পাঁচখানি কশেরুকা অবস্থিত। ইহারা সব পৃথকভাবে আছে। এইরূপ ব্যবস্থা আছে বলিয়াই আমাদের পিঠ কাঠের মত শক্ত নহে। আমরা ইচ্ছামত পিঠ বাঁকাইতে বা সোজা করিতে পারি। নীচের কটির পাঁচখানি কশেরুকা পরিণত বয়সে যুক্ত হইয়া **বস্তি** নামে এবং সর্বশেষের চারিখানি কশেরুকা একত্রে যুক্ত হইয়া **পুচ্ছ** নামে অভিহিত হয়। মগজ হইতে **মেরুমজ্জা** বাহির হইয়া কশেরুকার মধ্যের ছিদ্র দিয়া চলিয়া গিয়াছে। পৃষ্ঠের দুই পার্শ্বে দুইখানি ও সম্মুখের উপরিভাগে দুইখানি অস্থি দিয়া **স্কন্ধদেশ** গঠিত। ইহাদিগকে যথাক্রমে **অংস-ফলক** ও **কণ্ঠাস্থি** বলে।

ধড়ের উপরিভাগের গহ্বরকে বক্ষ বলে। বক্ষ নানাপ্রকার অস্থি দ্বারা এরূপভাবে গঠিত যে, ইহাকে একটি পিঞ্জরের মত দেখায়। এই পিঞ্জরের সম্মুখের অস্থির নাম **উরঃফলক**। পিঞ্জরের দুই পাশে চব্বিশখানি **পঞ্জরাস্থি বা পাঁজরা** বাহির হইয়াছে।




৬১নং চিত্র—দেহের বিভিন্ন অস্থি

**বক্ষ** দুই দিকে দুইটি **ফুস্‌ফুস্** ও বামদিকে **হৃদয়**—এই তিনটি অমূল্য যন্ত্রের আধার। সেইজন্য ইংরাজিতে ইহাকে Chest (সিন্দুক)




৬২নং চিত্র

বলে। আমরা ফুস্‌ফুস্ দিয়া শ্বাসকার্য চালাই এবং হৃদয় দিয়া সমস্ত দেহে রক্ত সঞ্চালন করি।

**উদর-গহ্বর**—বক্ষ-গহ্বরের নিম্নেই উদর-গহ্বর। এই দুই গহ্বরের মধ্যস্থলে একটি মাংসপেশীর পর্দা আছে; ইহাকে **মধ্যচ্ছদা** বলে অন্ননালী মধ্যচ্ছদা ভেদ করিয়া **আমাশয়ের** সহিত মিশিয়াছে। উদর-গহ্বরের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে **অন্ত্র, প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয়, বৃক্ক, অগ্ন্যাশয়** প্রভৃতি যন্ত্র অবস্থিত আছে (৫৯ ও ৬০নং চিত্র)।

(গ) **বাহু**—বাহু তিন অংশে বিভক্ত। যথা: (১) **প্রগণ্ড**—দেহকাণ্ড হইতে কনুই পর্যন্ত বিস্তৃত ও একখানি শক্ত অস্থি দ্বারা নির্মিত; (২) **প্রকোষ্ঠ**—কনুই হইতে হস্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ও দুইখানি অস্থি দ্বারা গঠিত এবং (৩) **হস্ত**—ইহা **মণিবন্ধ, করাস্থি, অঙ্গুলাস্থি**—এই তিন রকমের সাতাশখানি অস্থি দ্বারা গঠিত।

(ঘ) **পদ**—বাহুর ন্যায় পদও তিন অংশে বিভক্ত। যথা: (১) **উরু**—দেহকাণ্ড হইতে জানু পর্যন্ত বিস্তৃত এবং একখানি লম্বা শক্ত অস্থি দ্বারা গঠিত; (২) **জংঘা**—জানু হইতে গোড়ালি পর্যন্ত বিস্তৃত ও দুইখানি অস্থি দ্বারা গঠিত এবং (৩) **চরণ**—ইহা **সন্ধ্যস্থি, পদতলাস্থি** ও **অঙ্গুলাস্থি** এই তিন রকমের মোট ছাব্বিশখানা অস্থির দ্বারা গঠিত।

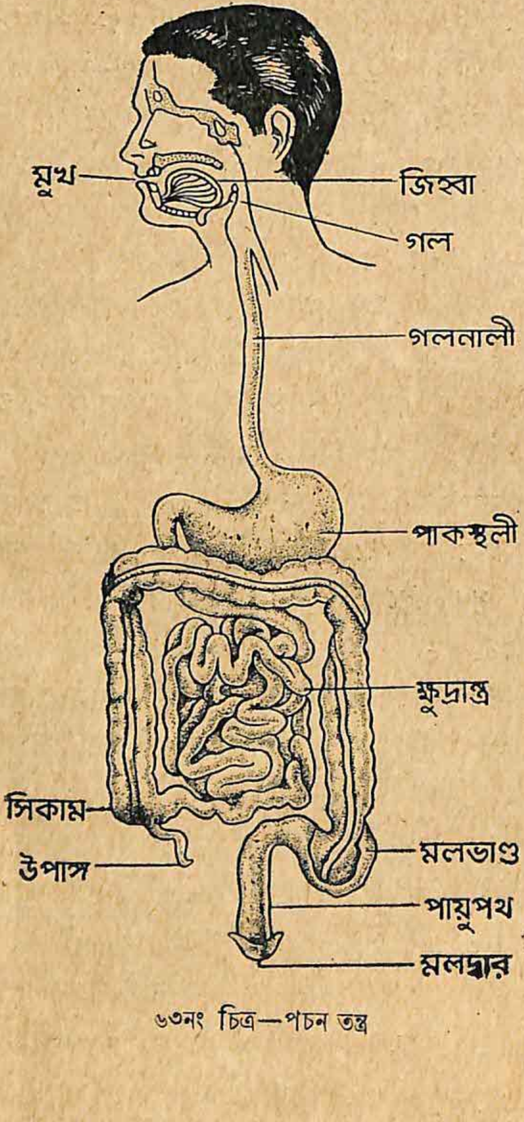
২। **পচন তন্ত্র** ( Digestive System ): প্রাণধারণের জন্য আমাদের আহারের প্রয়োজন। আমরা আহার্য দ্রব্য মুখ দিয়া গ্রহণ করি। মুখ হইতে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ নলের নাম **পৌষ্টিক নালী**। এই নালী প্রায় ২০ হাত দীর্ঘ। এই নালীর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম—**মুখ-গহ্বর, অন্ননালী, আমাশয়, অন্ত্র** ও **মলনালী**। এই পৌষ্টিক নালী ব্যতীত **যকৃৎ** ও **অগ্ন্যাশয়** নামক দুইটি যন্ত্র আমাদের পরিপাক-ক্রিয়ার সাহায্য করে।

**মুখ-গহ্বর**—মুখ-গহ্বরের মধ্যে দন্ত ও জিহ্বা থাকে।

দুই পাটিতে মোট বত্রিশটি দাঁত আছে। দাঁত দিয়া খাদ্যদ্রব্য কর্তন, ছিন্ন, চর্বণ ও পেষণ করা হয়।

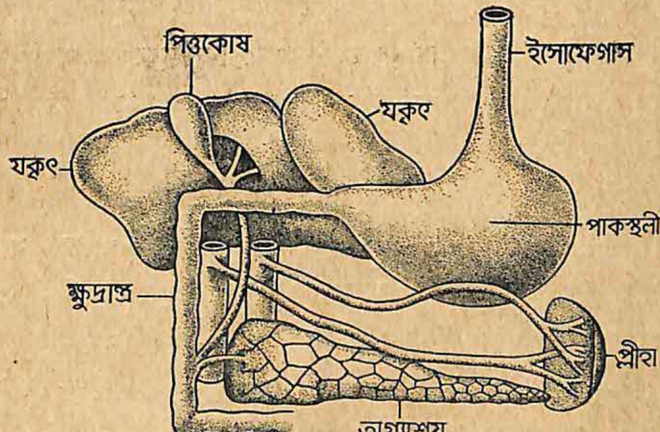
**জিহ্বা**—ইহার দ্বারা আহার্য দ্রব্যকে মুখের মধ্যে সর্বত্র নাড়াচাড়া করিতে পারি এবং অম্ল, তিক্ত ও মিষ্ট রস আস্বাদ করিতে পারি।

**লালাগ্রন্থি**—মুখ-গহ্বরে তিন জোড়া গ্রন্থি আছে। এইগুলি হইতে সর্বদাই আমাদের অজ্ঞাতসারে লালা নিঃসৃত হইয়া মুখ-গহ্বর ভিজাইয়া রাখে। লালা খাদ্যদ্রব্যকে সিক্ত, নরম ও পিচ্ছিল করে।




৬৩নং চিত্র—পচন তন্ত্র

ইহাতে খাদ্য গিলিবার পক্ষে সুবিধা হয়। লালার মধ্যে **টাইলিন** ( Ptyalin ) নামক জারক পদার্থ ( Enzyme ) শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে চিনিতে পরিণত করে।




৬৪নং চিত্র—পরিপাক যন্ত্র (ইসোফেগাস-অন্ননালী)

খাদ্যদ্রব্য মুখে পুরিয়া দন্ত, জিহ্বা ও লালার সাহায্যে ভাল করিয়া চর্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করা উচিত ; নচেৎ খাদ্যদ্রব্য ভাল হজম হয় না এবং অজীর্ণ ও অম্লরোগ উৎপন্ন হয়।

**অন্ননালী** বা **গলনালী**—ইহা প্রায় ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ। অন্ননালীর মাংসপেশীগুলির নিম্নদিকে সঙ্কোচনের ফলে নরম ও পিচ্ছিল আহার্য দ্রব্য আমাশয়ে চলিয়া যায়।

**আমাশয় বা পাকস্থলী** (Stomach)—পৌষ্টিক নালীর এই অংশ সর্বাপেক্ষা মোটা ; প্রস্থ প্রায় ৫ ইঞ্চি। সাধারণ অবস্থায় উহা সঙ্কুচিত থাকে কিন্তু খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করিলে উহা ফুলিয়া উঠে। আহার্য দ্রব্য আমাশয়ে প্রবেশ করিলে এক প্রকার পাচক রস নির্গত হইয়া ভুক্তবস্তুর সহিত মিশিয়া যায়। ইহাকে **আমাশয় রস** বলে। এই

রসে **হাইড্রোক্লোরিক** অম্ল এবং **পেপসিন, রেনিন** ও **লাইপেস** নামক তিনটি জারক পদার্থ থাকে। এই রস জীবাণুনাশক। সেইজন্য খাদ্যদ্রব্যের সহিত কোন অনিষ্টকর জীবাণু প্রবেশ করিলে এই অম্লরসে প্রায়ই মরিয়া যায়। পেপসিন প্রোটিন-জাতীয় পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া সহজপাচ্য করে এবং রেনিন দুধকে ছানায় পরিণত করে। আমাশয়ের মাংসপেশী সঙ্কোচন দ্বারা আহার্য দ্রব্য ঠিক ময়দা ঠাসার মত ক্রমাগত মথিত ও অন্দোলিত হয়।

**ক্ষুদ্রান্ত্র** – অর্ধজীর্ণ খাদ্যদ্রব্য আমাশয় হইতে ক্ষুদ্রান্ত্রে স্থানান্তরিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে শুঁয়ার মত শোষক যন্ত্র দিয়া খাদ্যের সারাংশ শোষিত হইয়া রক্ত-প্রবাহের সঙ্গে মিশিয়া যায় ক্ষুদ্রান্ত্রে তিন প্রকার রসের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য সম্যক্‌রূপে পরিপাক হয়। যথা—

(১) **অগ্ন্যাশয়** হইতে **ক্লোম রস** ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। ইহাই শ্রেষ্ঠ পাচক রস। অগ্ন্যাশয় রসে তিন রকম জারক পদার্থ থাকে। ইহারা শ্বেতসার, স্নেহ ও প্রোটিন জাতীয় পদার্থকে সহজে হজম করে। অগ্ন্যাশয়ে **ইন্‌সুলিন** নামক একপ্রকার পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইহা চিনিকে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধীভূত হইতে সাহায্য করিয়া দেহে তাপের সৃষ্টি করে।

(২) **যকৃৎ হইতে পিত্তরস** ( Bile )—উদরের ডান দিকে পাঁজরার নিম্নে যকৃৎ থাকে। শ্বেতসার পদার্থ ক্ষুদ্রান্ত্রে চিনিতে পরিণত হইলে এই চিনি যকৃতে জমা থাকে। যকৃতে **পিত্তরস** প্রস্তুত হয়। পিত্তরস প্রধানত স্নেহজাতীয় পদার্থকে জীর্ণ ও শোষিত হইতে সহায়তা করে। শরীরের কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় পদার্থ পিত্তরসের সহিত নিঃসৃত হইয়া যায়।

(৩) **আন্ত্রিক রস**—ইহা অন্ত্র হইতে নির্গত হয়। এই রস অজীর্ণ এবং অর্ধজীর্ণ প্রোটিনকে সম্পূর্ণরূপে হজম করে। ইহা ইক্ষু এবং অন্যান্য চিনিকে সম্পূর্ণরূপে হজম করে।

(৩) **শ্বাসতন্ত্র** ( Respiratory system ) : শ্বাসকার্য প্রধানত পাঁচটি যন্ত্র দিয়া সম্পন্ন হয়। যথা:—( ক ) **নাসাপথ,** ( খ ) **ফ্যারিংস,** ( গ ) **শ্বাস-নালী,** ( ঘ ) **ফুস্‌ফুস্‌** এবং ( ঙ ) **মধ্যচ্ছদা**।

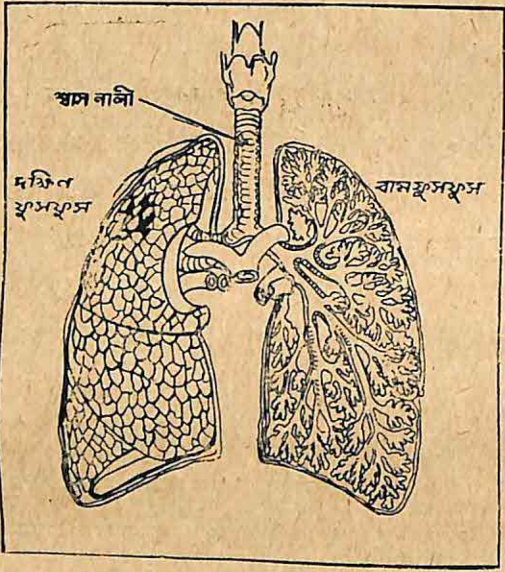
(ক) **নাসাপথ**—নাসিকার দুই ছিদ্র-মুখকে নাসারন্ধ্র বলে। নাসারন্ধ্র হইতে ফ্যারিংস পর্যন্ত বিস্তৃত ত্রিকোণাকার গহ্বরকে **নাসাপথ** বলে। নাসাপথের পশ্চাদ্ভাগের রন্ধ্র দুইটি ফ্যারিংসের সম্মুখ ও উপরিভাগে আসিয়া উন্মুক্ত হইয়াছে। বায়ু নাসারন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া ক্রমে ফুস্‌ফুসে যায়। বায়ু আঁকাবাঁকা পথ বাহিয়া যায় বলিয়া গরম হয় ও বায়ুস্থ ধূলিকণা নাসারন্ধ্রের লোমে আট্‌কাইয়া যায়। মুখ দিয়া বাতাস লইলে তাহা গরম হয় না বা ধূলিকণা আট্‌কায় না।

( খ ) **ফ্যারিংস**—ইহা পেশী ও পর্দাসম্বলিত প্রায় পাঁচ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি নল। ইহার উপর দিকে নাসিকা ও মুখ-গহ্বর উন্মুক্ত হইয়াছে। নীচের দিকে সম্মুখভাগে শ্বাসনালী ও পশ্চাদ্ভাগে খাদ্যনালী ফ্যারিংসে আসিয়া মিশিয়াছে।

( গ ) **শ্বাসনালী**—ইহার দুইটি ভাগ আছে। উপরিভাগকে **স্বরযন্ত্র** বলে। স্বরযন্ত্রের ক্রিয়ার সাহায্যে আমরা কথা বলি, গান গাই। শ্বাসনালীর নিম্নের অংশকে **ট্রেকিয়া** ( Trachea ) বলে। উহা আরও নিম্নে দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়াছে। এই শাখাদ্বয়কে **ব্রঙ্কাই** (Bronchii) বলে।

(ঘ) **ফুস্‌ফুস্‌** (Lungs)—বক্ষোগহ্বরের দুই দিকে দুইটি ফুস্‌ফুস্‌ আছে। বাম ফুস্‌ফুস্‌ দুই খণ্ডে ও দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্‌ তিন খণ্ডে বিভক্ত। ফুস্‌ফুস্‌ ফাঁপা। ব্রঙ্কাই দুইটি ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ক্রমে এই শাখাগুলি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া **বায়ুথলিতে** উন্মুক্ত হয়। এই বায়ুথলিতে বহু বায়ু-কোষ আছে।

বায়ু-কোষগুলির গাত্রে পাতলা পর্দা থাকে। পর্দার উপরে কৈশিকাবলীর সূক্ষ্ম জাল বিস্তৃত আছে। কৈশিকাবলীর অভ্যন্তরে সারা




৬৫নং চিত্র—ফুস্ফুস্

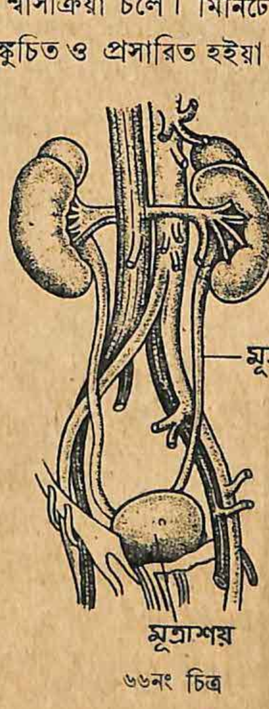
দেহ হইতে অশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হয়। এই রক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে পূর্ণ। বায়ু অক্সিজেন বহন করিয়া ফুস্ফুসের কোষে লইয়া আসে। রক্ত ও বায়ুর মধ্যে কৈশিকাবলীর ও বায়ু-কোষের পাতলা পর্দা থাকে। এই পর্দার মধ্য দিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ু-কোষে চলিয়া যায় এবং অক্সিজেন বায়ু-কোষ হইতে কৈশিকাবলীর ভিতর প্রবেশ করিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। দূষিত রক্ত এইরূপে পরিষ্কৃত হয়।

(ঙ) **মধ্যচ্ছদা**—ইহা বুক ও পেটের মধ্যে মাংসপেশী নির্মিত একটি পর্দা। ইহা পঞ্জরাস্থির সহিত সংযুক্ত।

**শ্বাসক্রিয়া**—মধ্যচ্ছদা সঙ্কুচিত হইলে ফুস্‌ফুস্ প্রসারিত হয় এবং তাহার আয়তন বৃদ্ধি পায়। বাহিরের অধিক চাপের বায়ু শ্বাসপথে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে এবং তাহাকে পূর্ণ করিয়া ফেলে। ইহাকে **শ্বাসগ্রহণ** বা **প্রশ্বাস** বলে। বাহিরের ও ভিতরের বায়ুর চাপ সমান হইয়া গেলেই আর ভিতরে বায়ু প্রবেশ করে না। ইহার পরই স্থিতি-স্থাপকতার গুণে পেশীগুলি প্রসারিত হয়; সেইজন্য বক্ষোগহ্বরের আয়তন ছোট হয়। সঙ্গে সঙ্গে ফুস্‌ফুস্ সঙ্কুচিত হয় এবং বায়ু শ্বাসপথে বাহির হইয়া যায়। ইহাকে **শ্বাসত্যাগ** বা **নিশ্বাস** বলে।

শ্বাসতন্ত্রের পেশীগুলির সাহায্যেই শ্বাসক্রিয়া চলে। মিনিটে আঠার বার শ্বাসতন্ত্রের পেশীগুলি এইরূপে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে।

রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড অধিক মাত্রায় জমিলে, শ্বাস-প্রশ্বাসের স্নায়ু-কেন্দ্র উত্তেজিত হয় এবং তদনুসারে শ্বাসকার্য নিয়ন্ত্রিত হয়।



৬৬নং চিত্র

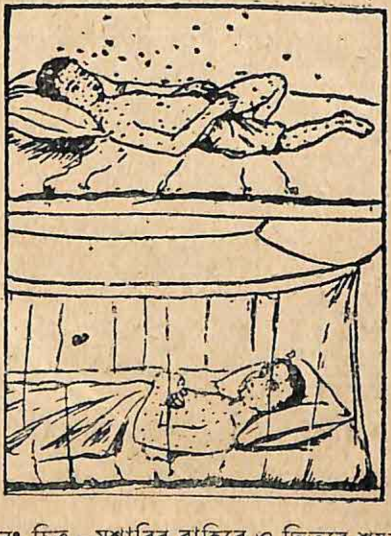
**দেহের বহির্দ্বার** ( Excretory System ): নিম্নলিখিত যন্ত্র দিয়া দেহের দূষিত দ্রব্য বহির্গত হয়। (১) **ফুস্‌ফুসের** নিশ্বাস বায়ুর সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প বহির্গত হয়। (২) আহার্য দ্রব্যের জলীয় অংশ বৃহদন্ত্রে শোষিত হয়। সেই জল বৃক্কদ্বয়ের মধ্য দিয়া মূত্ররূপে এবং চর্মের মধ্য দিয়া ঘর্মরূপে দেহ হইতে নির্গত হয়। বৃক্ক সংখ্যায় দুইটি। ইহাদের আকার

শিমের বীচির মত। বৃক্ক দেহের দূষিত ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থকে রক্ত হইতে পৃথক করে। (৩) খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় কঠিন পদার্থ বৃহদন্ত্রে জীবাণু দ্বারা মলে পরিণত হয় এবং মলদ্বার দিয়া বহির্গত হয়।

## ৫। কতকগুলি সাধারণ রোগ

**ম্যালেরিয়া ঃ রোগের কারণ ও সংক্রমণ ঃ** এই রোগ ভারতের বিশেষত বাংলার ভীষণ শত্রু। এনোফেলিস নামক মশকী ম্যালেরিয়া রোগীকে দংশন করিলে সেই ব্যক্তির রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার জীবাণু মশকীর উদরে প্রবেশ করে এবং দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে। কিছুদিন পরে এই মশকী সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিলে ঐ জীবাণুগুলি লালার সহিত সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিয়া রক্তের লোহিত কণিকাকে ধ্বংস করে এবং দেহে বিষ উৎপন্ন করে।





৬৭নং চিত্র—মশা কামড়াইতেছে ৬৮নং চিত্র—মশারির বাহিরে ও ভিতরে শয়ন

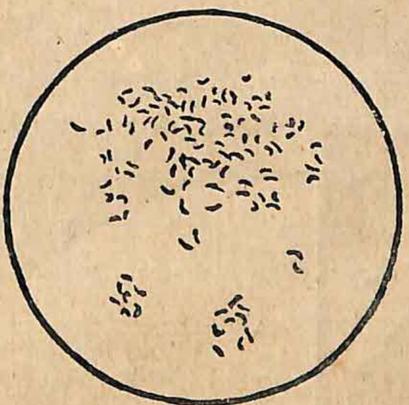
**রোগের লক্ষণ ঃ** কম্পজ্বর, ঘর্ম দিয়া জ্বরত্যাগ, পিপাসা, বমি, মাথার যন্ত্রণা, প্লীহা-বৃদ্ধি, রক্তহীনতা এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

**রোগ-নিবারণের উপায় ঃ** (১) পুষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি করিবে, (২) মশকী বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে এবং অপরিষ্কার ও অন্ধকার স্থানে বাস করে। সুতরাং বাড়ীর নিকটে খানা, ডোবা, গর্ত ও ভাঙ্গা হাঁড়ী-কলসী বা ঝোপ-জঙ্গল রাখিবে না। অনেক সময় জলের উপর কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিলে মশার বাচ্চা দম আট্‌কাইয়া মরিয়া যায়। (৩) মশকীর দংশন হইতে আত্মরক্ষার জন্য রাত্রে মশারির ভিতর শয়ন করা, সন্ধ্যার পর গায়ে কাপড় দিয়া থাকা উচিত, ঘরে প্রচুর আলো ও বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ঘরে ধূপ, ধূনা ও গন্ধক পোড়ান উচিত। ইহাদের গন্ধ মশা সহ্য করিতে পারে না। (৪) ম্যালেরিয়ার সময় কুইনাইন সেবন করা উচিত। কুইনাইন ম্যালেরিয়ার জীবাণু ধ্বংস করে।

**কলেরা ঃ রোগের কারণ ও সংক্রমণ ঃ** এই রোগ ( , ) কমা চিহ্নের ন্যায় এক রকম জীবাণু হইতে সংক্রমিত হয়। কলেরা রোগীর



৬৯নং চিত্র—কলেরা রোগী বমি করিতেছে



৭০নং চিত্র—কলেরার জীবাণু

মলমূত্রদুষ্ট বস্ত্রাদি জলে ধৌত করিলে জল দূষিত হয়। এই জল ব্যবহার করিলে রোগ সংক্রমিত হয়। মাছি, পিপীলিকা প্রভৃতি কীট,

পতঙ্গ রোগীর মল ও বমির উপর বসিয়া খাদ্যদ্রব্যের উপর বসিলে খাদ্যদ্রব্য দূষিত হয়। এই খাদ্যদ্রব্য আহার করিলে রোগ সংক্রমিত হয়।

**রোগের লক্ষণ :** ঘন ঘন দাস্ত ও বমি, চাউল-ধোয়া জলের মত পাতলা দাস্ত, প্রস্রাব বন্ধ, হাতে পায়ে খিল ধরা, সর্বাঙ্গ শীতল হওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

**রোগ-নিবারণের উপায় :** (১) জল, দুধ ও মাছি কলেরার জীবাণুর প্রধান বাহন। দুধ ও জল উত্তমরূপে ফুটাইয়া পান করা উচিত। আহার্য দ্রব্যে মাছি বসিতে দেওয়া উচিত নয়। (২) রোগীর মলমূত্র ও বমি ফিনাইল, আইজল প্রভৃতি জীবাণু-নাশক ঔষধ মিশাইয়া মাটিতে পুতিয়া ফেলা উচিত। রোগীর মলদুষ্ট বস্ত্রাদি পোড়াইয়া ফেলা কিংবা জীবাণু-নাশক লোশনে ডুবাইয়া রাখিয়া পরে কাচিয়া লওয়া উচিত। (৩) কলেরার সময় কলেরার টিকা লওয়া উচিত। (৪) পচা ও বাসি খাদ্য আহার করা উচিত নয়। (৫) শুশ্রূষা-কারীর হাত-পা জীবাণু-নাশক লোশনে ধুইয়া ফেলা উচিত।

**বসন্ত রোগ : রোগের কারণ ও সংক্রমণ :** জলবসন্ত তত মারাত্মক নহে কিন্তু সাধারণ বসন্ত খুব মারাত্মক ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি। রোগীর ক্ষতের পূঁযে ও রসে, কফে, থুথুতে ও ক্ষতের মামড়িতে রোগের জীবাণু থাকে। ইহারা শুকাইয়া সূক্ষ্ম কণায় বায়ুতে ভাসিয়া বেড়ায় এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। রোগীর ক্ষতে বা দেহমলে মাছি, মশা, পিপীলিকা বসিয়া এই জীবাণু ছড়াইয়া বেড়ায়, রোগীর বস্ত্র বা দেহ স্পর্শ করিলে এই রোগ সংক্রমিত হয়।

**রোগের লক্ষণ :** প্রথমে সর্বাঙ্গে বেদনা-বোধ, মুখ ও দেহ লাল্চে হওয়া, পরে জ্বর, সর্বাঙ্গে জ্বালাবোধ এইগুলি প্রাথমিক লক্ষণ। দুই

তিন দিন পরে কপালে, ঘাড়ে, কব্জিতে ও হাতের তালুতে গুটি বাহির হয়। গুটি পাকিবার সময় পুনরায় জ্বর হয়।

**রোগ-নিবারণের উপায়ঃ** (১) বসন্ত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। সুতরাং রোগীকে পৃথক ঘরে মশারির ভিতর রাখিবে। ঘরের দরজা-জানালা খুলিয়া রাখিবে। রোগীর ব্যবহৃত কোন দ্রব্য বাহিরে আনিবে না। (২) রোগীর মলমূত্র, কফ, থুথু ও ক্ষতের পূঁয ফর্মালিন লোশনে রাখিয়া পরে পোড়াইয়া ফেলিবে।



৭১নং চিত্র—বসন্ত রোগী

(৩) ঘরে ধূপ, ধূনা বা গন্ধক পোড়াইবে। রোগীর মাম্‌ড়ি খসিয়া নূতন চামড়া বাহির না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে পৃথক ঘরে রাখিবে। মাম্‌ড়ি খুব ছোঁয়াচে। (৪) বসন্তের টিকা লওয়া উচিত।

**খোস-পাঁচড়া ঃ রোগের কারণ ও রোগ সংক্রমণঃ** ইহা চর্মরোগ এবং সংক্রামক ব্যাধি। ছোট ছোট কীট চর্মকে আক্রমণ করে। চর্মের উপর ফুস্‌কুড়ির মত পূঁযপূর্ণ পাঁচড়া হয়। খোস-পাঁচড়ার পূঁয বা রক্ত সুস্থ ব্যক্তির গায়ে লাগিলে এই রোগ হয়। রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি, গামছা ও বিছানা ব্যবহার করিলেও এই রোগ হয়।

**রোগ-নিবারণের উপায়ঃ** (১) রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি, বিছানা ও গামছা কখনও ব্যবহার করিবে না। (২) চর্ম পরিষ্কার রাখিবে।

**আকস্মিক দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ** (ক) **অগ্নিদাহ ও ঝলসান**—অগ্নির সাক্ষাৎ সংস্পর্শে দগ্ধ হইলে তাহাকে **অগ্নিদাহ** বলে।

উত্তপ্ত পদার্থ, যথা, গরম জল ও দুধের সংস্পর্শে দগ্ধ হইলে তাহাকে **ঝলসান** বলে।

(১) কোন দ্রব্যে আগুন লাগিলে উহার উপরে কম্বল, কাঁথা বা সতরঞ্চি চাপা দিতে হয়। ইহাতে বায়ু-সংযোগ বন্ধ হইয়া আগুন নিভিয়া যায়। (২) বস্ত্রাদিতে আগুন লাগিলে কখনও ছুটাছুটি করিও না। (৩) দগ্ধস্থান অতি সাবধানে বিশুদ্ধ তুলা দিয়া পরিষ্কার করিবে।



৭২নং চিত্র—আগুন নিভাইবার প্রণালী

(৪) দগ্ধ বা ঝলসান স্থানে জল দিবে না। ইহাতে জ্বালা বৃদ্ধি হয় এবং ফোস্‌কা পড়ে। (৫) ক্ষতস্থানে বিশুদ্ধ এরারুট ছড়াইয়া দেওয়া বা উহা জলপাই তৈল বা নারিকেল তৈল সিক্ত ন্যাকড়া বা তুলি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। ন্যাকড়া সিক্ত করিবার জন্য জলপাই তৈল ও চূণের জলের মিশ্রণ বা এক ভাগ কার্বলিক অ্যাসিড ও পনর ভাগ জলপাই তৈলের মিশ্রণ বা পোড়া গব্য ঘৃত ব্যবহার করা যায়। (৬) ঝলসান স্থানে আলুবাটা, কলা চটকান, কস্টিক লোশন, সুরাসার, চূণের জল ও নারিকেল তৈলের মিশ্রণ বা বারনল নামক ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

**পতন** ঃ—পতনের দ্বারা অস্থি ভঙ্গ বা স্থানচ্যুত হইলে সঙ্গে সঙ্গে

চিকিৎসক ডাকাইবে। রোগীকে শোয়াইয়া আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটি চেরা বাঁশ বা কাঠ দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। সামান্য মচ্‌কান হইলে আহত স্থান বরফ দিয়া জলপটি দিয়া বাঁধিবে। অনেক সময় হলুদ-বাটা, পেট্রোল-সিক্ত ন্যাকড়া, চূণ ও মধুর প্রলেপ দিলেও উপকার হয়।

**ক্ষত :** (১) শরীরের কোন স্থান সামান্য কাটিয়া গেলে ঐ স্থানটি স্পিরিট দিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া টিংচার আইওডিন-সিক্ত তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিবে। ক্ষতস্থানে জল দিবে না।

(২) ক্ষতস্থান হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত মোক্ষণ হইলে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়া টিংচার আইওডিন-সিক্ত তুলা দিয়া জোরে চাপিয়া ধরিবে এবং চিকিৎসকের সাহায্য লইবে। যদি ধমনী কাটা যায় ক্ষতের উপরদিকে, যদি শিরা কাটা যায় তবে ক্ষতের নীচের দিকে বন্ধনী দিবে। অনেক সময় বরফ দিলেও রক্ত-মোক্ষণ বন্ধ হয়।

(৩) দুর্বাঘাস ও গাঁদাফুলের রস দেওয়ার প্রথা আছে, তবে ইহাদিগকে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত।

**জলমগ্ন :** জলমগ্ন ব্যক্তিকে বাঁচাইবার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা উচিত।



৭৩নং চিত্র—জলমগ্ন ব্যক্তির কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার প্রথম অবস্থা

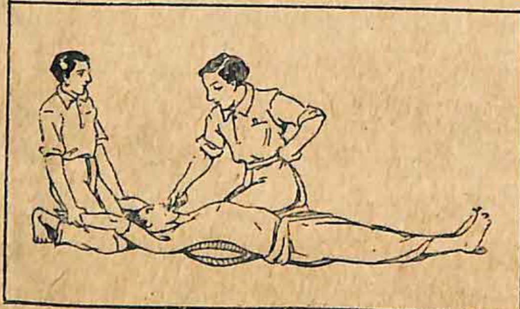
(১) **জল-নির্গমন :** রোগীর মুখে ন্যাকড়া দিয়া লালা ও ময়লা পরিষ্কার করিয়া দিবে। তারপরে তাহাকে উপুড় করিয়া শোয়াইবে। বুকের নীচে পাতলা বালিশ রাখিবে। পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়া জিহ্বা

টানিয়া এক পাশে রাখিবে এবং কোমরের উপর হাঁটুর চাপ দিবে। তারপরে দুই পাশ ধরিয়া দেহের উপর দিক উঁচু করিবে। কিন্তু মাথা নীচু থাকিবে। ইহাতে মুখ দিয়া জল বাহির হইবে। তারপরে রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া পিঠের নীচে বালিশ দিবে।



৭৪নং চিত্র—জলমগ্ন ব্যক্তির কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় অবস্থা

ইহাতে পাকস্থলীর অবশিষ্ট জল মুখে আসিবে। তারপর মুখ কাত করিলেই অবশিষ্ট জল মুখে আসিবে।



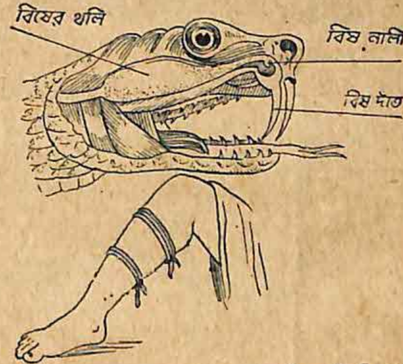
৭৫নং চিত্র—জলমগ্ন ব্যক্তির কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার তৃতীয় অবস্থা

(২) **কৃত্রিম শ্বাসকার্য**: রোগীকে কাঁধের নীচে বালিশ দিয়া এমনভাবে রাখ, যাহাতে মাথাটি পিছন হইতে একটু ঝুলিয়া পড়ে। রোগীর দুই হাতের নিম্নাংশ তাহার মাথার দুই পাশে টানিয়া ধরিবে।

ইহাতে ফুস্‌ফুসে বায়ু ঢুকিবে। পরে হাত দুইটি মুড়িয়া বুকে অল্প চাপ দিবে। ইহাতে ফুস্‌ফুস্‌ হইতে বায়ু বাহির হইবে। এইরূপ দশ-বার বার করিলে শ্বাসক্রিয়া চলিবে। এই সময় রোগীর দেহ কম্বল দিয়া ঢাকিবে এবং গায়ে ও পায়ে গরম জলের বোতল সেঁক দিবে। ইহাতে দেহে তাপ ও রক্ত-চলাচল বৃদ্ধি পাইবে।

**দংশন**ঃ (ক) কাঁকড়া বিছা দংশন করিলে দষ্টস্থানে শোধিত ছুঁচ দিয়া কয়েকটি ছিদ্র করিয়া টিংচার আইওডিন বা পটাশ প্যারমাঙ্গানেট বা অ্যামোনিয়া, জল বা গরম লবণ জল বা তামাক পাতার রস, পেঁয়াজের রস অথবা কলার পাতাবাটা প্রলেপ লাগাইলে উপকার হয়।

(খ) **সর্পদংশন**ঃ বিষধর সর্পের উপর পাটিতে দুইটি বিষদাঁত থাকে। দাঁতের নীচেই বিষের থলি থাকে। দংশনকালে সর্প দাঁত বসাইলে ক্ষতস্থানে থলি হইতে নালী দিয়া বিষ আসিয়া পড়ে। বিষ রক্তের সঙ্গে দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বিষধর সর্পদংশনে দুইটি ছিদ্র পাশাপাশি দেখা যায়। বিষহীন সর্পদংশনে ক্ষতস্থানে অনেকগুলি ছোট ছোট ছিদ্র দেখা যায়। বিষের জন্য ক্ষতস্থান ফুলিয়া উঠে। চারিপাশের রক্ত নীল হয় এবং জমাট বাঁধে। ক্ষতস্থান চিরিয়া ফেলিলে কালো রক্ত বাহির হয়। পনর-বিশ মিনিটে রোগী অবসন্ন হয় এবং মুখ দিয়া লালা বহির্গত হয়। অবশেষে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।



৭৬নং চিত্র—সর্পাঘাত ও প্রাথমিক চিকিৎসা

সর্পদংশনে নিম্নলিখিত প্রাথমিক ব্যবস্থা করা দরকার ঃ

(১) সর্পদংশন মাত্রই দ্রুত ক্ষতের উপর চারি আঙ্গুল অন্তর পরিধেয় বস্ত্রের পাড় বা মোটা দড়ি দিয়া জোরে বন্ধন দিবে, যাহাতে ঐ স্থানে রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়। (২) ক্ষতস্থানের চারিপাশে ধারাল ছুরি বা ব্লেড দিয়া চিরিয়া চাপ দিয়া রক্ত মোক্ষণ করিলে কালো রক্তের সহিত বিষ বাহির হইয়া যাইবে। লাল রক্ত বাহির হইলে রক্ত মোক্ষণ বন্ধ করিবে। (৩) এখন ক্ষতস্থানে কিছু পটাশ প্যারমাঙ্গানেট গুঁড়া ছড়াইয়া দিবে। (৪) রোগীকে ঘুমাইতে দিবে না। রোগীকে সামান্য জলমিশ্রিত ব্রাণ্ডি পান করিতে দিবে। (৫) বন্ধনী এক ঘণ্টার বেশী রাখিবে না। (৬) সর্পবিষ প্রতিষেধক ইন্‌জেকসান দিবে।

(গ) **পাগলা কুকুরের দংশন ঃ** পাগলা কুকুরে কামড়াইলে জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়। ইহা খুব মারাত্মক রোগ। পাগলা কুকুর কামড়াইলে উহার দেহ হইতে এক প্রকার জীবাণু রোগীর দেহে প্রবেশ করে। এই জীবাণু কোন প্রকারে নষ্ট করিতে না পারিলে, কামড়াইবার ১৫।১৬ দিন পর হইতে ৭।৮ মাসের মধ্যে রোগীর জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়। এই রোগের প্রতিষেধক ইন্‌জেকসান আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ইন্‌জেকসান কলিকাতায় ট্রপিক্যাল স্কুল অফ্ মেডিসিন নামক প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে পাওয়া যায়।



৭৭নং চিত্র—কুকুরে কামড়াইতেছে

# পরিশিষ্ট

## প্রশ্নাবলী

### ভূমিকা

১। বর্তমান যুগকে কোন্ যুগ বলে ? ২। বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে বল।

### প্রথম অধ্যায়

১। বায়ুর উপাদানগুলির নাম কর। ২। কাহাকে ক্ষার বলে ? ৩। বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন চিনিবার কয়েকটি পরীক্ষার নাম কর এবং ক্ষারীয় প্যাইরোগ্যালেট পরীক্ষাটি বিস্তৃতভাবে লিখ। ৪। বায়ুতে জলীয় বাষ্প ও ধূলিকণার অস্তিত্ব কিরূপে জানা যায়, তাহা পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া বল। ৫। জীবের সহিত বায়ুর সম্পর্ক সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ৬। নিম্নলিখিতগুলির তুলনা কর :—(ক) দহন ও শ্বাসকার্য, (খ) দহন ও মরিচা। ৭। বায়ু-সঞ্চালন কাহাকে বলে ? বায়ু-সঞ্চালনের সাধারণ নীতি ও মানবের স্বাস্থ্যের উপর ইহার প্রভাব বর্ণনা কর। ৯। বাসঘর ও রান্নাঘরের বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা কিরূপে করা যায়, তাহা বিস্তারিতভাবে লিখ। ১০। বায়ুকল সম্বন্ধে যাহা জান বল।

### দ্বিতীয় অধ্যায়

১। জলের উৎপত্তি স্থানগুলির নাম কর। ২। জল বিশুদ্ধিকরণের প্রণালীগুলির নাম কর এবং তাহাদের কয়েকটি পরীক্ষা প্রণালীসহ বল। ৩। মিশ্র পদার্থ ও যৌগিক পদার্থের পার্থক্যগুলি বর্ণনা কর। ৪। বায়ুর ও জলের উপাদানের কয়েকটি বিশিষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ৫। নিম্নলিখিত-গুলির বিষয়ে কি জান বল :—(ক) জলের দ্রাবক শক্তি ; (খ) বায়ুর আর্দ্রতা ও শুষ্কতা ; (গ) শিশির ও তুষার ; (ঘ) প্রকৃতিতে জলচক্র। ৬। খর জল ও মৃদু জল কাহাকে বলে ? ৭। জলচক্র-চালিত কল সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

## তৃতীয় অধ্যায়

১। শক্তি বলিলে কি বুঝ? ইহার উৎস কি ও কয় প্রকার? ২। যন্ত্র ও জীবন্ত যন্ত্রের তুলনা কর। ৩। তাপ ও তাপের উৎসের একটি বিশদ বর্ণনা দাও। ৪। তাপের ফল বলিলে কি বুঝ? উহার প্রয়োগে পদার্থের কি কি পরিবর্তন হয় তাহা লিখ। ৫। উষ্ণতামান যন্ত্র কাহাকে বলে? উহা কয় প্রকার? প্রত্যেকটির বিস্তৃত বিবরণ লিখ। ৬। তাপ-চলাচল বলিলে কি বুঝ? উহা কয় প্রকারে সঞ্চালিত করা যায় বল। ৭। আলোকের বিকীর্ণ শক্তি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ৮। উদ্ভিদের কার্বন-আত্মকরণ কাহাকে বলে? উহার সম্বন্ধে কি জান বল।

## চতুর্থ অধ্যায়

১। সজীব পদার্থ বা জীব-জগৎ কাহাকে বলে? ২। নিম্নলিখিতগুলির তুলনা কর :—(ক) জীব ও জড়ের পার্থক্য; (খ) উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর পার্থক্য। ৩। প্রাণী এবং উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ বর্ণনা কর। ৪। মটর গাছের বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের কার্য পর্যবেক্ষণ করিয়া বিস্তৃত বিবরণ লিখ। ৫। নিম্নলিখিত-গুলি সম্বন্ধে যাহা জান বল :—(ক) ঈস্ট; (খ) অ্যামিবা; (গ) মস। ৬। মানব-দেহের প্রধান প্রধান অংশগুলির নাম কর। ৭। শ্বাসকার্য প্রধানত যে সকল যন্ত্র দিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাদের নাম কর। ৮। প্রশ্বাস ও নিশ্বাসের পার্থক্য কি? কোন্‌টি দ্বারা মানবদেহের কোন্ কার্য সম্পন্ন হয়, তাহা লিখ। ৯। কয়েকটি সাধারণ রোগের সংক্রমণ ও তাহাদের নিবারণের উপায় বর্ণনা কর। ১০। কয়েকটি আকস্মিক দুর্ঘটনা ও তাহাদের প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে যাহা জান বল।



সমাপ্ত